অঙ্গাবরণে গলদেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত ইহাঁর আচ্ছাদিত। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা কিম্বা স্ফটীক মালা কিছুই নাই, মুখমণ্ডল ভস্ম কিম্বা চন্দন চর্চ্চিত নহে, পৃষ্ঠ-লম্বিত কেশ জটা, ও আবক্ষ বিস্তৃত শ্মশ্রু রাশি মাত্র তাঁহার শুভ্রশ্বেত অসামান্য জ্যোতি সম্পন্ন প্রশান্তগম্ভীর সহাসমুখের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত শত সহস্র অনাথা, দীন দুঃখী, রোগশোক, পাপতাপ, দুঃখজ্বালা হইতে মুক্ত হইবার কামনায় তাঁহার চরণ তলে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাহাকেও ঔষধ দিতেছেন, কেহ বা তাঁহার পবিত্র হস্তস্পর্শে মাত্র শান্তিলাভ করিতেছে। যাহার রোগ শোক প্রতিকার করা তাঁহার সাধ্যাতীত তাহাকেও এমন স্নেহের বাক্যে ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখাইতেছেন যে, সেও শান্তি সুখ অনুভব করিতেছে। এইরূপে কত নিরাশ হৃদয় আশা-পূর্ণ হইতেছে—কত রোগী, পাপী, তাপী, দীন, দুঃখীর বিষন্ন-মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। যুবক এমন দৃশ্য কখনও দেখেন নাই, শত শত লোকের সুখে তাঁহার হৃদয় পুরিয়া গেল, তিনি পূর্ণ হৃদয়ে অভিভূত চিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভক্তিউথলিতহৃদয়ে সন্ন্যাসীর শান্ত গম্ভীর দেবশ্রীপূর্ণ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে বেলা অধিক হইল, দ্বিপ্রহরের বড় বিলম্ব নাই, সন্ন্যাসীর ধ্যানের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি গৃহে গমন করিবেন; ভীড়ও কিছু কমিতে লাগিল, যাহারা

ক্রমেই এই ভালবাসার পরিমাণ বাড়াইতে থাক, ক্রমে যখন অভ্যাসে অভ্যাসে বিনা চেষ্টায় এই ভালবাসা অবারিত বেগে অহর্নিশি স্বতঃ উৎসারিত হইবে, যখন এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত প্রেমকে ধরিতে পারিবে—যখন সেই ভালবাসায় স্বার্থের বিন্দুমাত্র থাকিবে না, তখনই সুসিদ্ধ হইবে এখন নহে। যাও বৎস গৃহে গিয়া ইহার সাধনা কর,"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে, যুবার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি এত আনন্দ বুঝি কখনও পূর্ব্বে অনুভব করেন নাই—যুবক কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "আবার কবে আসিব" —

সন্ন্যাসী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর আসিতে হইবে না যদি প্রয়োজন হয় আমাকে দেখিতে পাইবে" বলিয়া অতি স্নিগ্ধ স্থির কটাক্ষে যুবকের প্রতি চাহিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, যুবার দেহ সবল হইল, প্রাণ তেজস্বী হইল, হৃদয় জুড়াইয়া গেল, ভক্তিভরে অভিবাদন পূর্ব্বক সেথান হইতে তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন আর সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছবি।

যেদিনের কথা হইতেছে, সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর নৌকা হইতে হুগলি সহরের দিকে চাহিয়া দেখ—সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে। এখন শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর ন্যায় শ্বেত প্রাসাদগুলি, একটির পর একটি সারি বাঁধিয়া গঙ্গা উপকূলে শোভা পাইতেছে না, প্রাসাদের আশে পাশে, ছোট বড় গাছ গুলি, যেখানে যেটি শোভা পায় সেখানে সেটি সাজান নাই। কোথায় বা খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বড় ছোট গাছের রাশি জঙ্গল বাঁধিয়াছে, গায়ে গায়ে ঘেসা-ঘেসি করিয়া আপনাদের গাঢ় আলিঙ্গনে অবনত হইয়া লতার জটাজুট লইয়া নদীতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই জঙ্গলের পরেই হয়ত খানিক দূর লইয়া একটি আর গাছ দেখা যায় না, সেখানে সারি সারি, চক্রের মত, আঁকা বাঁকা, নানা গড়নে সাজিয়া ছোট ছোট পাতার কুটির গুলি উইঢিবির মত প্রকাশ পাইতেছে। আর তাহারি পাশাপাশি এক একটি বড় বড় বট অশ্বত্থের রাশি রাশি পাতার ফাঁক দিয়া পর্ত্তুগীজ নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাংশ ও ওলন্দাজদিগের এক-তল পুরাতন অট্টালিকা শ্রেণী অতি দীন হীন ভাবে উঁকি মারিতেছে, আবার কোথায় বা উপকূল যোড়া এক বিচিত্র উদ্যান যুক্ত বিচিত্র বৃহৎ অট্টালিকা, চারিদিকের ছোট ছোট

কুটীরদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আশে পাশের বড় বড় গাছ গুলির প্রতি উপেক্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। আর এইরূপ একটি প্রাসাদের বাতায়নে একটি ছোট সুন্দর মুখ ফুটিয়া তাহার মধুররূপে উপকূলের কবিতাময় ভাবটি আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যুবতী বাতায়নে বসিয়া কি সুঁচের কাজ করিতেছিলেন, কাজ করিতে করিতে কচি কচি আঙ্গুলগুলি বুঝি ক্লান্ত হইল, আনত মৃণাল কণ্ঠ, বুঝি ব্যথিত হইল, একবার কাজ ছাড়িয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে মেঘের স্তরের উপর স্তর, পাছে একটি হইতে একটি সরিয়া পড়ে, একটি হইতে একটির বিচ্ছেদ হয়—তাহারা কত না ভয়ে ভয়ে কতনা প্রাণপণে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আলিঙ্গন করিয়া আছে—কিন্তু হায় দেখিতে দেখিতে তবু ঐ স্তরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একটি হইতে একটি সরিয়া পড়িতেছে,—ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। যুবতীর হৃদয়েও সহস্র চিন্তা আসিয়া সেই মেঘপুঞ্জের মত স্তূপ বাঁধিতে লাগিল। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধরিল। মুন্না চমকিয়া উঠিল, একবার সহসা কি যেন কি আশায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া যুবতী হাসিয়া বলিল, ‘বুঝিয়াছি মসীন, ছোখ ছাড়’’ মসীনও হাসিয়া চোখ ছাড়িয়া মুন্নার চোখের উপরে একখানি ছবি ধরিয়া বলিলেন,

"কেমন বল দেখি"। এইখানে ছবির কথা একটু বলিয়া লই। মহম্মদ মসীন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসেন, পথে একজন ছবিবিক্রিওয়ালা তাঁহাকে মহা ধরিয়া পড়িল, তাঁহার ছবি কিনিবার কোনই ইচ্ছা কিম্বা আবশ্যক ছিল না, কিন্তু যখন ছবিবিক্রিওয়ালা একখানি ছবির দুই টাকা দাম চাহিয়া, শুষ্ক মুখে মিনতি করিয়া বলিল "মহাশয় গো সমস্ত বেলায় আজ একখানা ছবি বিক্রি করিতে পারিনি, এখন যদি কিছু পাই তবেই ছেলে গুলো খেতে পাবে" তখন মসীন আর একটি কথা না কহিয়া দুই টাকার স্থলে দশটি টাকা দিয়া ছবিখানি তুলিয়া লইলেন। ছবিওয়ালা অবাক হইয়া রহিল।

ভ্রাতার হাত হইতে ছবিটি স্বহস্তে লইয়া মুন্না তাঁহার দিকে ফিরিয়া বসিল। নামেতেই সকলে বুঝিয়াছেন ইহারা হিন্দু নহেন। মহম্মদ মসীন ও মুন্না দুজনে ভ্রাতা ভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাই বোন নহেন। মুন্নার মাতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান মসীন। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। মসীন ও মুন্না বরাবর এক বাড়ীতেই থাকিতেন, উঁহারা দুইজনে চারি বৎসরের মাত্র ছোট বড়, সেই জন্য উহাঁদের মধ্যে মান্যের ব্যবধান নাই, সমকক্ষ ভাবেই উহাঁরা পরস্পরকে ভাল বাসেন। মসীন ষড়বিংশতি বর্ষীয় যুবক, উন্নত

ললাট, পূর্ণায়তন নয়ন উদার-ভাবজ্যোতি পূর্ণ; ঈষদ্দীর্ঘ নবীন শ্মশ্রুশোভিত গৌর বর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী, অথচ সে তেজ, অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত। প্রশস্ত বক্ষশালী সুগঠন বলিষ্ঠ দেহ যেন শত শত দুর্ব্বলের আশ্রয় নিকেতন। তাঁহার সেই স্নেহানুরাগের সবল আশ্রয়ের ছায়ায় দুর্ব্বল মুন্নাকে তিনি যেন অতি যত্নে রক্ষা করিতে চান।

ছবিখানি দেখা হইলে মুন্না একটুখানি হাসিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল "এমন ভাল ছবি কোথায় পেলে? কে দিলে?" মসীন বলিলেন, "কেন দেবে আবার কে? অমনি কি কিছু পাওয়া যায় না?"

মুন্না। "এমন ভাল জিনিস অমনি পাওয়া যায় তাত জানতুম না।"

মসীন। "কেন ভাল জিনিষের কি আর দর আছে? এ পর্য্যন্ত তাতো দেখলুম না।"

মুন্না। "তবে বুঝি এখনো জহরী কেউ জন্মায়নি, তাই জহরের এত অনাদর।"

মসীন। "তুই ভাই আদরটা একবার দেখিয়ে দে, আমি বেচতে এসেছি, একটা মোটা দর বল,"

মুন্না হাসিয়া বলিল, "তোমার বেলায় ভাল জিনিসের দর নেই, তুমি পাও কুড়িয়ে, আর অন্যের বেলা মোটা দর চাও, বেশত মজা!

মসীন। "বুঝিলে নে এই হচ্চে সেয়ানা লোকের কাজ,"

মুন্না ছোট মাথাট নাড়িয়া, অলকগুচ্ছগুলি দুলাইয়া একটু মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল—"তুমিই এক সেয়ানা আর জগৎ শুদ্ধ নির্ব্বোধ বুঝি,"

মসীন। "নিদেন জগতের অর্দ্ধেক লোক মেয়ে জাত। তাইত তোর কাছে আগে বিক্রির জন্য এসেছি। কত দিবি বল।" বলিতে বলিতে মসীন একটু হাসিলেন, সে হাসিতে তাঁহার শুভ্র ললাটে ঈষৎ সরস বিদ্রুপময় ভাবের যেন রেখা পড়িল, মুন্না বলিল, "মরে যাই আর কি, উনি যা পেলেন কুড়িয়ে, তাই আমি পয়সা দিয়া কিনিব। এক কানাকড়িও না।"

"মসীন ঘাড়নাড়িয়া বলিলেন—তুমি কানাকড়িও দিলে না, কিন্তু এর মধ্যে এর যে হাজার টাকা দাম উঠিয়াছে।" মুন্না হাসিয়া বলিল, "এমন নির্ব্বোধ কে সে?"

মসীন। "সে নির্ব্বোধ আর কেউ না, আমার সুযোগ্য ভগিনীপতি সলেউদ্দীন।"

স্বামীর নাম শুনিয়া মুন্নার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, হাসির রেখাটি অধর হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এ কথা শুনিলেই মুন্নার কষ্ট হইবে, তাহা মসিন জানিতেন, সেই সম্ভাবিত কষ্টটা উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়েই প্রথম হইতে ওরূপ তামাসার ভাবে তিনি কথা পাড়িয়াছিলেন। মুন্নাকে

বিষণ্ন দেখিয়া মসীন তামাসা রাখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমি ঠাট্টা করিতেছি না, সত্যই হাজার টাকার বিনিময়ে সলেউদ্দীন এইরূপ একখানি ছবি পাইয়াছেন, এরূপ করিয়া আর কদিন চলিবে, অমন অতুল ঐশ্বর্য্য সবত যায় যায়, তুমি কি একটি কথা কহিবে না।"

চোখের জল চোখে রুদ্ধ করিয়া মুন্না বলিলেন, "ভাই যাহার ধন তিনি এরূপ করিলে আমার কি হাত? আমি কে"। সে কথায় সে স্বরে মসীনের সুন্দর মুখ কাল হইয়া পড়িল, ভাসন্ত চোখে যাতনা ফুটিয়া বাহির হইল— একটু পরে একটুখানি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া মসীন বলিলেন "ধন কার? তোমারি কি সব ধন নহে? তোমার মুখে ঐ কথা শুনিলে একজন বালকেও হাসিবে। সকল স্ত্রীলোক যদি তোমার মত হইত তবেত দেখিতেছি জগতের ধারা উলটাইয়া যাইত।"

মুন্নার পিতার ঐশ্বর্য্যেই মুন্নার স্বামী ধনী সত্য, কিন্তু মুন্না কখনো ও ভাবে তাহা দেখে নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হইত না, যে উহা তাহার স্বামীর নহে মুন্নার নিজের ধন। ভ্রাতার কথায় মুন্না আশ্চর্য্য হইল, মুন্না ক্রুদ্ধ হইল, মুন্না বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। মসীন তাহা বুঝিতে পারিলেন—কথাটা শামলাইয়া লইবার ইচ্ছায় বলিলেন "কিন্তু যার ধন সে যদি পাগল হইয়া যাহা ইচ্ছা করে, তবে সে পাগলকে কি কেহ নিরস্ত করিবে না"—

তাত সত্য, কিন্তু মুন্না কেমন করিয়া স্বামীকে বলিবে? মুন্না যে তাঁহাকে কতবার কাঁদিয়া, কত মিনতি করিয়া, কত করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে কি কোন ফল হইয়াছে? তিনি কি তাহাতে একবার ভ্রূক্ষেপ করিয়াছেন? তবে আবার মুন্না কি করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে যাইবে? অভিমান করিয়া যে মুন্না নীরব থাকিতে চাহে তাহা নহে, মুন্নার অভিমান নাই। যে হৃদয় একবার প্রেম প্রতিদান পাইবার পর সে প্রেমে সন্দেহ করিয়াছে, যে সন্দেহে, যে অবিশ্বাসে বিশ্বাস লুকাইয়া রহিয়াছে, যে নিরাশায় এখনো আশা, ভরসা দিতেছে, সে হৃদয়ে অভিমান আছে; মুন্না অভিমান করিবে কেন? মুন্নার মনে স্বামীর ভালবাসার আশা বিন্দু মাত্র নাই, সে অবিশ্বাসে সন্দেহের রেখা মাত্র নাই, স্থির-নিরাশায় মুন্নার হৃদয় গঠিত, মুন্না অভিমান করিবে কি? মুন্না যে স্বামীকে কিছু বলিতে চাহে না—সে তাহা হইতেও অধিক দুঃখে, অধিক কষ্টে। মুন্না তাহার সমুখে যাতনার অশ্রু নদী বহাইয়াছে, তিনি একবার ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, প্রাণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস টুটিয়া যদি আপনা হইতে কোন কথা বাহির হইয়াছে তিনি না শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যদি কখনো আত্মহারা হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির আশার ন্যায় স্বামীর চরণ ধরিয়াছে তিনি সেই নির্ভরকারী লতাকে নির্দয়ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহের চক্ষে অনু-

গ্রহ চক্ষে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। তাহার পর এখন যাতনার তীব্র অনলে হৃদয় ভষ্মীভূত করিলে, হৃদয়ের অগ্নি নিশ্বাস গভীর নিশীথের বায়ু তরঙ্গে মুন্না মিশাইতে থাকে, উন্মত্ত দুঃখের অশ্রু লহরী বরফের মত হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া ফেলে, তবু কখনো স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আজ মুন্নার প্রাণের ভিতর স্বামীকে যে কথা বলিবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে সে মুন্নার নিজের কোন কথা নহে, তবে ইহাতে সঙ্কোচ কিসের? মুন্না ভীরু নিস্তেজ হৃদয় পাষাণ বলে বাঁধিয়া স্বামীকে একবার এ কথা বলিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিল। নিজের জন্য হইলে সহস্র কষ্টেও মুন্না বলিত না—কিন্তু স্বামী আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতে বসিয়াছেন, মুন্না একবার সাবধান করিবে না? স্বামী তাহার কথা শুনিবেন না সে তাহা জানে—তবু সে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া একবার তাঁহাকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিল, তার পর আস্তে আস্তে মসীনকে বলিল "তিনি কি আমার কথা শুনিবেন? আচ্ছা আমি একবার বলিয়া দেখিব"—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

ক্রমে বেলা হইল, মুন্না হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখিয়া সাংসারিক কর্ম্মে উঠিয়া গেল, মসীন বাহিরে চলিয়া গেলেন। রোজ যেরূপ কাজ কর্ম্ম করে মুন্না সে দিনও সেইরূপ করিল—সন্ধ্যা হইলে রোজ যেরূপ পিতাকে বসিয়া খাওয়ায় তেমনি হাসিমুখে তাঁহার কাছে বসিয়া, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, আদর করিয়া খাওয়াইল, হাসির মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য কেবল মুন্না অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল, গল্পের মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল, একটি মাত্র ছোট খাট নিশ্বাস কে জানে কেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল মাত্র। মুন্নার পিতা সেই হাসির ছটার মধ্যে গল্পের উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুক্কায়িত অশ্রু জল দেখিতে পাইলেন—তিনিও অব্যক্ত ভাবে হৃদয়ে একটি যাতনা লইয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। মুন্না নির্ব্বোধ সরলাবালা ভাবিল—তাহার পিতাকে সে আজ ফাঁকি দিয়াছে তিনি তাহার অসুখ ধরিতে পারেন নাই—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা নিশ্চিন্ত রহিল। পিতাকে খাওয়াইয়া আবার মুন্না তাহার শয়ন কক্ষের বাতায়নে আসিয়া বসিল। বিকালেই চাঁদ

উঠিয়াছিল—আবার তাহা ডুবিয়া গেছে, পরপারে গাছের রাশির মধ্যে অন্ধকার ভীষণ ভাবে মূর্ত্তিমান হইয়াছে, রাশি রাশি খদ্যোতিকা মালা সেই আঁধার কায়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গা স্বপ্নমোহে মহান আকাশ, অগণ্য নক্ষত্র রাশি, আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিয়া, সে হাসি, সে স্বপ্ন বাহিরের স্বপ্ন জগতে সত্য বলিয়া ছড়াইয়া ঘুমঘোরে বহিয়া যাইতেছে। বালিকা মুন্না সেই নিশীথের ঘুমন্ত আঁধারময় প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তখনও মুন্না শয়ন করিতে গেল না। তৃতীয় প্রহরও যায় যায়, তখন বাহিরের নৃত্য গীত চীৎকার থামিয়া পড়িল, সলেউদ্দীনের বন্ধু বান্ধবেরা একে একে গৃহে গমন করিল, তাঁহার বিলাস মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই ঘরেই নীচে মসলন্দের উপর বিশ্রাম শয়ন করিলেন। এই সময় মুন্না অতি ধীরে ধীরে সভয়ে সঙ্কোচে পা ফেলিয়া একখানি ক্ষীণ ছায়ার মত সেই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। সলেউদ্দীন অর্দ্ধনীমিলিত চক্ষে তাহা দেখিলেন বলিলেন "কে এ ও—" মুন্নার মুখে কথা ফুটিল না, সেই যে দুপুর বেলা হইতে মুন্না সমস্তক্ষণ ধরিয়া কিরূপে কেমন করিয়া, স্বামীকে কি কথা বলিবে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এখন তাহা সমস্ত ব্যর্থ হইল, একেবারে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল—প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিতে লাগিল, চোখে কেমন জল

আসিতে লাগিল, মুন্না কেন যে এখানে আসিয়াছে, আসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না,—ভাবিল ফিরিয়া যাই,—তাহাতেও যেন পা সরে না,—ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া মুন্না পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সলেউদ্দীন এ দিকে নেশার ঘোরে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে হইল স্বর্গের একটি হুরি বুঝি তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছে—কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে উঠিতে গেলেন—পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন, চক্ষু বুজিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা ভয় হইল চোখ খুলিলে আর দেখিতে পাইবেন না। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কথায় যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই "অয়ি স্বর্গের আলোক, এস আমার হৃদয় আলো কর।"

মুন্না বুঝিল স্বামী ভুল বুঝিয়াছেন, মুন্নার তখন কথা ফুটিল—ধীরে ধীরে বলিল "আমি মুন্না"—সলেউদ্দীনের স্বর্গ হইতে রসাতলে যেন দারুণ পতন হইল,—অর্দ্ধচক্ষু খুলিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "মুননা—তুমমি—ক্যা—আন" মুন্না কেন এখন কি বলিবে, সে যে নিজেই তাহা ভুলিয়া গেছে। এই সময় মসীন গৃহের বারান্দায় মুন্নার চোখের সমুখে একবার দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সলেউদ্দীন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। মসীনকে দেখিয়া মুন্নার নিস্তেজ

প্রাণে যেন বল সঞ্চার হইল, যে কথা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছে তাহা বলিবেই বলিয়া স্থির করিল—প্রাণপণে হৃদয়ে বল আনিয়া মুন্না বলিল, "একটি কথা আছে"

সলেউদ্দীন আগেকার ভাষায় বলিলেন, "কথা ঢের শুনিয়াছি, আবার সকালে শুনিব, এখন কেন"

সকালে তিনি যত কথা শুনিবেন তা মুন্নাই জানে, প্রায় সমস্ত রাত মজলিসে কাটাইয়া সমস্ত দিন তাঁহার ঘুমাইয়া কাটে, তাহার পর অপরাহ্নে উঠিয়া বেশ বিন্যাস করিয়া আবার আসরে নামেন—কথা কহার অবকাশ ত পড়িয়া আছে। মুন্না ইহা হইতে কোমল উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, তার পর স্বামীর নিকট আসিয়া একখান ছবি তাহার কাছে রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, আবার মুখ বাধিয়া গেল, এত সঙ্কল্প সকল টুটিয়া পড়িল। সলেউদ্দীন কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি উঠাইয়া লইলেন, ঢুলুঢুলু নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অমনি জগতের যত রাগ তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, তিনি নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া আগেকার অপেক্ষা স্পষ্ট কথায় বলিলেন, "কোথায় পাইলে?" মুন্না ধীরে ধীরে বলিল "মসীন কিনিয়া আনিয়াছেন।" তিনি আরো জ্বলিয়া গেলেন, তিনি জানিতেন সে ছবি একখানি মাত্র জগতে ছিল দৈবক্রমে তিনি পাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ ছবি আর যে কোথাও কিনিতে মিলিবে

হা কক্ষণোই হইতে পারে না, তাঁহার দেয়ালের ছবি যে কেহ চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র তাঁহার সংশয় রহিল না। স্খলিত সুশ্রাব্য নানারূপ ভাষায় সকালবেলা উঠিয়াই সেই চোরের ঘাড় ভাঙ্গিবার বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। মুন্না সাহস করিয়া অনেক বার বলিল যে "না তাঁহার ঘরের ছবি কেউ লয় নাই, সে ছবি যেখানকার সেই খানেই আছে, চাহিয়া দেখিলেই তাহা দেখিতে পাই-বেন"। কিন্তু মুন্নার কথা কে শোনে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না, শেষে একবার চোখ খুলিয়া দেয়ালে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই সে ছবি সেই খানেই আছে। কিন্তু রাগটা তখন অতিরিক্ত হইয়া পড়ি-য়াছে সহজে নিভিবার নয়, বাঁকাচোরা কর্কশ-স্বরে বলি-লেন "তুমি কে? এ এ ছবি দেখাও, যা—আও—চাই না, দেখিতে চাই না।"

এতক্ষণ ভাল করিয়া মুন্নার কথা ফোটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার মুন্না থামিয়া পড়িতেছিল, স্বামীর নির্দ্দয় বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া রুদ্ধউৎস ফুটিয়া বাহির হইল, মুন্নার মুখ ফুটিল, মুন্নার সাহস বাড়িল, মুন্না ধীরে ধীরে বলিল—

'আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিতে আসি নাই। আমি দাসী, প্রভু'কে আজ মিনতি করিয়া চরণ ধরিয়া যে কথা বলিতে আসি-য়াছি তাহা না বলিয়া যাইব না, একবার সংসার পানে

চাহিয়া দেখ। দেখ ইচ্ছা করিয়া দিন দিন আপনার সর্ব্বনাশ কিরূপে টানিয়া আনিতেছ, আমি তাহা বই আর কিছু চাহি না। নিজের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। সংসারের ধনরত্নে আমি সুখী হইব না। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্য ইহাতে এক বিন্দুও ভাবি না। কিন্তু ধন না থাকিলে তোমার কি হইবে।"

এক নিঃশেষে কথা গুলি বলিয়া যেন মুন্না শ্রান্ত হইয়া পড়িল, সমস্ত বল যেন তাহার নিঃশেষিত হইয়া গেল, নিস্তব্ধে ব্যগ্র ভাবে কেবল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এই মাতাল অবস্থায় ও সকল কথা স্বামীর মাথায় প্রবেশ করিতে পারে কি না তাহা মুন্না ভাবিল না, হয়ত বা মুন্না জীবনে স্বামীর সজ্ঞান অবস্থা দেখে নাই, সুতরাং সজ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবেচনা শক্তির কিরূপ প্রভেদ হয় তাহাই বা সে স্পষ্ট বুঝিত না, সেই জন্যই বা এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না। কিন্তু সলেউদ্দীনের মাথায় অতগুলা কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি কেবল শুনিলেন—"ধন আর রত্ন, ধন আর রত্ন" কিছু পরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, "জাহাঁন্নম! ধন রত্ন যদি খোয়াইতাম অত রত্ন তোমার গায়ে কেন? তোমার ঐ অলঙ্কার আগে যাইবে, তবে আমার ধন ফুরাইবে।"

অবসন্ন ম্রিয়মান বালিকা দারুণ আঘাতে সবল হইয়া, অশ্রুহীন নেত্রে অটলপদক্ষেপে আরো নিকটে অগ্রসর

হইয়া সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিল "স্বামিন্ এ অলঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি? আমার মত দুঃখিনীর আবার সাজ সজ্জা কিং? হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে, বাহির সাজাইয়া কি হইবে? আমি নিজের সুখের জন্য অলঙ্কার পরি না—যদি ইহা দেখিতেও তোমার কষ্ট হয়, সে কষ্টটুকুও আমি তোমাকে দিতে চাহি না—নাথ। তোমার কষ্ট ঘুচাইতে আমি হৃদয় পাতিয়া রাখিয়াছি, তবে কি এ সামান্য অলঙ্কার খুলিতে আমার দুঃখ হইবে? ইহা তোমার পরে যে কাজে লাগিবে, এখনও সেই কাজে লাগুক, আমার গায়ে ইহা বৃথা পড়িয়া আছে।"

মুন্না বলিতে বলিতে অলঙ্কার গুলি স্বামীর সম্মুখে খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। সলেউদ্দীনের নেশা যেন অনেকটা ছুটিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিলেন, মুন্না যখন চলিয়া গেল, তাঁহার মনে একটি অশান্তির ভাব, আসিয়া পড়িল। কিন্তু পারস্য রাজবংশীয় সলেউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ ভাব হওয়া বিষম দুর্ব্বলতা, তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া আর এক বোতল মদ আনিতে বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ যাত্রা।

মতাহার আগা হুগলী সহরের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। ইহাঁর আর কেহ নাই, একমাত্র কন্যারত্ন মুন্নাই ইহার সংসারের বন্ধন, হৃদয়ের সম্বল। অতি শৈশবে কন্যা মাতৃহীনা হইয়াছে সেই অবধি মতাহার আর বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিলে মুন্না পাছে পর হইয়া যায়—মুন্না তাঁহার বড় আদরের রত্ন, যতনের ধন। ক্রমে মুন্না যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার শৈশবের রূপগুণ বয়সের সহিত প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, স্নেহময় পিতার মন ততই স্নেহের গর্ব্বে পূরিয়া উঠিতে লাগিল, আনন্দের উচ্ছাসে উথলিত হইতে লাগিল। কিন্তু আহ্লাদের মধ্যেও এমন রূপগুণসম্পন্ন স্বর্গীয় রত্ন কাহাকে সমর্পণ করিবেন—কাহার কণ্ঠে ইহা শোভমানা হইবে, এই এক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। কত পাত্র আসিতে যাইতে লাগিল—কোনটিই আর তাঁহার মনের মত হয় না, নবাব খাঁজাহান খাঁ পর্য্যন্ত মুন্নার হস্ত প্রার্থনা করিলেন তাঁহাকেও মতাহারের পসন্দ হইল না। মতাহার এক আধারে সকল গুণ চান, তিনি চান, তাঁহার জামাতা রূপবান, গুণবান, রাজবংশীয়,

এই সবই হইবে, কেবল তাহাই নহে, মতাহারের পুত্র নাই, তাহাকে পুত্র করিয়া সে সাধও মিটাইবেন, তাঁহার জামাতা তাঁহার ঘরে থাকিবে। খাঁজাহান খাঁর যদিও ধন মান বংশের অভাব নাই কিন্তু ইহাঁর সহিত বিবাহ দিলেত কন্যাকে গৃহে রাখা যায় না, তাহার পর আবার খাঁজাহানের অনেকগুলি বিবাহ, নবাব হইলে কি হয়—এরূপ স্থলে কোন্ প্রাণ ধরিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহার ত ধনের অভাব নাই, তিনি তাহা ছাড়া আর যাহা চাহেন, এক স্থানে সমস্ত পাইয়া উঠেন না।

অবশেষে মুন্নার বিবাহ হইল, ধন লোভে পারস্য রাজবংশীয় এক যুবক তাহার বংশ মতাহারকে দান করিল। মতাহার রাজবংশের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বস্ব সম্পত্তি জামাতার নামে লিখিয়া দিয়া তবে এই নাম তাঁহার হস্তগত করিতে হইল। ইহাতে আর মতাহারের দুঃখ কি, তাঁহার ধন সম্পত্তি সকলি তাঁহার কন্যা জামাতার, কিছু দিন পরে ত উহারাই লইবে, না হয় আগেই উহাদের দিলেন, ইহাতে তাঁহার দুঃখ নাই। মতাহার যেরূপ চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল, তবে ঠিক সেরূপ হইল না। জামাতা রূপবান—রাজবংশীয়, শ্বশুরালয়বাসী সকলি হইল—কেবল যেরূপ গুণবান চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল না। কিন্তু বিবাহের সময় জামাতার এ অভাব বুঝিতে পারেন নাই, তখন সকল বিষয়েই মনো-

মত হইবে আশা করিয়াছিলেন, জামাতার দোষগুলি ক্রমে ফুটিতে লাগিল।

পিতা এত কষ্ট করিলেন তবু কন্যা সুখী হইল না, মুন্নাকে মতাহার বেগম করিলেন—কিন্তু সুখী করিতে পারিলেন না।, জামাতা কন্যার গৌরব বুঝিল না, হস্তী-পদতলে রত্ন দলিত হইতে লাগিল।

নবাব সলেউদ্দীন দিনরাত বিলাস সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন বিলাস ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না কিছু চাহেন না। সেই অপরিসীম বিলাস-তৃষ্ণা আর তাঁহার কিছুতেই মেটে না। সে তৃষা কুবেরের ধন সমুদ্রও যেন নিমেষে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে। মতাহার আগার ঐশ্বর্য্য দুই চারি বৎসরের মধ্যেই ফুরায় ফুরায় হইয়া আসিল। মতাহার দেখিলেন একদিন তাঁহার কন্যার বুঝি বা পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হয়, যে কন্যা রাজযত্নে পালিত হইয়াছে তাহাকে একদিন সত্যই বুঝি বা একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হয়। মতাহারের হৃদয়ে অসীম বেদনা, কন্যার মুখের দিকে আর চাহিতে পারেন না, দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। এক দণ্ড যে মুখ না দেখিলে মতাহার থাকিতে পারিতেন না সেই মুখ দেখিলে তাঁহার নয়ন যেন আপনা হইতেই অন্যদিকে ফিরিতে চায়। মুন্না বড় বুদ্ধিমতী, মুন্না বড় স্নেহময়ী, পিতার কষ্টের ভয়ে সে তাহার হৃদয় বেদনা

লুকাইয়া রাখে, হাসি দিয়া অশ্রুজল ঢাকিতে চায়। পিতাকে বিষণ্ণ দেখিলে হাসিয়া হাসিয়া কাছে যায়, হর্ষভরে কথা কহে, ছেলেবেলায় পিতার সহিত কোন দিন কি কথা হইয়াছিল সেই সকল সুখের কথা ফিরাইয়া ফিরাইয়া আনে, পিতাকে বুঝাইতে চাহে তাহার প্রাণে কোন কষ্ট নাই, কেন তবে তিনি অসুখী হইবেন।

মুন্নার সেই হাসিতে সেই হর্ষের কথায়, মতাহারের প্রাণ আরো কাঁদিয়া উঠে, সেই হাসির আলোকে মুন্নার প্রাণের আঁধার তিনি যেন আরো সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। মতাহার মনে ভাবেন—"মুন্না ধন আমার, আমি যে তোমার সব হাসি ঘুচাইয়াছি, তবে আবার এ হাসি কেন?" ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ নেত্রে কন্যার কাছে সরিয়া আসেন, মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে পিঠে হাত রাখিয়া কি ভাবিয়া কে জানে বলিয়া উঠেন "আমার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারিবি"—মুন্না হাসিয়া হাসিয়া বলে—"পারিব না? পারিব বইকি" মতাহারের চোখে জল পুরিয়া আসে—"মুন্না দুদের বাছা, ফুলের মেয়ে কত কষ্ট সহিতেছে—আরো কি ইহা হইতে সহিবার কিছু আছে ভগবান!"

এইরূপে দিন যায়, মতাহারের মনের স্থিরতা নাই, কন্যার দুঃখ দেখিবেন না ভাবিয়া কখনো দূরে পলাইতে চান, আবার কন্যার কাছে আসিয়া তাহার সেই মুখখানি

দেখিলেই সে ভাব আর মনে স্থান পায় না, তখন মনে করেন—"মাগো এ মুখখানি কি না দেখিয়া থাকা যায়? ইহাকে একাকী কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইব, যা অদৃষ্টে আছে দুজনে ভোগ করিব, ভিক্ষা করিতে হয় দুজনে হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিব।"

কিন্তু এরূপ অবস্থায় দিন কাটিল না, যে রাত্রের ঘটনাটি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই তাহা মতাহারের কাণে উঠিল, কেবল তাহা নহে, যাহা হয় নাই—এমন অনেক কথা পর্য্যন্ত তিনি শুনিতে পাইলেন, তিনি শুনিলেন জামাতা মুন্নাকে মারিয়া সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার পর স্বচক্ষে যখন তিনি কন্যার সেই দীনহীন অলঙ্কারশূন্য বেশ দেখিতে পাইলেন তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। তিনি যে সলেউদ্দীনের সহিত বিবাহ দিয়া কি জঘন্য কাজ করিয়াছেন, নিজের নিকট, প্রাণের কন্যার নিকট, তাঁহার দেবতার নিকট কি ঘোর পাপ করিয়াছেন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন, এ পাপের শাস্তি কোথায় গিয়া অবসান বুঝিতে পারিলেন না। একদিন হয়ত বা জামাতা মুন্নাকে হত্যা করিবে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আনিয়া হত্যা করিবে, আর তাঁহার তাহাই একটা রক্তমাংসহীন শবের মত বসিয়া দেখিতে হইবে, এমন বল নাই, সামর্থ্য নাই, উপায় নাই, যে তাহা হইতে কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন। মতাহার শিহরিয়া উঠি-

লেন—আকুল ভাবে কাঁদিয়া উর্দ্ধ নয়নে বলিলেন "জগদীশ্বর আমার পাপের শাস্তিতে অনাথা বালিকাকে আর বধিও না, যত কিছু তোমার দণ্ড আছে—তাহা পাপ তাপের এই বৃদ্ধ মাথায় নিক্ষেপ কর,আমি সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাহা বহন করিব—"

হৃদয়ের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে দারুণবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহার প্রাণের সমস্ত বল দিয়া অন্তর-দেবতাকে অতি আকুল ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, সেই দিন তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল যে দেবতার নিকট গিয়া তাঁহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আর অন্য উপায় নাই, মুন্নার মঙ্গলের আর আশা নাই, দেবতা ভিন্ন মনুষ্যে জামাতার শুভমতি ফিরাইতে পারিবে না। সেই দিন প্রাণের সহিত সবলে যোঝাযুঝি করিয়া স্নেহের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূর তীর্থে পীরের নিকট গিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। কাহাকে মনের কথা বিশেষ কিছু বলিলেন না—কেবল সে দিন সন্ধ্যার পর আহারান্তে উঠিয়া আসিবার সময় মুন্নাকে বলিলেন—"মুন্না আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—একবার তীর্থ করিয়া আসি। কবে মরি ঠিক কি? শীঘ্র যাইব ভাবিতেছি।" মুন্না তখন পান লইয়া পিতাকে দিতে যাইতেছিল, হাতটি কাঁপিয়া পানটি পড়িয়া গেল, চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে বড় বড় দুই ফোঁটা জল মাটিতে পড়িল, বৃদ্ধ মতাহার আর সেখানে দাঁড়াইতে

পারিলেন না; বাহিরে শয়নকক্ষে গিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর প্রাতঃকালে একদিন মুন্নার চ'খের জলের কুয়াসার উপর দিয়া একখানি নৌকা ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে কত দূরে চলিয়া গেল, ক্রমে দিগন্তের সীমায় মিশিয়া অদৃশ্য হইল, আর কিছুই দেখা গেল না, মুন্নার যাহা কিছু ছিল সব দিগন্তের পরপারে গিয়া হারাইয়া গেল; সত্যই পিতা মুন্নাকে ফেলিয়া গেলেন।

মুন্না তাহার পরেও কিছুক্ষণ সেই থানে দাঁড়াইয়া রহিল, এখনও যেন সেই নৌকাখানি দেখিবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যখন দেখিল, সারা রাতদিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও সে নৌকা আর ফিরিবে না—যখন বুঝিল হয়ত বা এ জন্মেই আর তাহা ফিরিবে না—তখন অশ্রুজলের সহিত তাহার হৃদয় যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিল; কি করিবে কোথা যাইবে—ভাবিয়া না পাইয়া ছুটিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল—যে গৃহে তাহার স্বামী ঘুমাইতেছিলেন, অজ্ঞাতভাবে সেই দ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—তখন যেন তাহার চৈতন্য হইল, আস্তে আস্তে চোখের জল মুছিয়া নিঃশব্দপদনিক্ষেপে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

সমস্ত রাত বাহির বাটীতে সুরাপানে মত্ত থাকিয়া সলেউদ্দীন শেষ রজনীতে নিতান্ত বিভোর হইয়া সেই কক্ষেই শয়ন করেন, অন্তঃপুরে শুইতে আসা আর তাঁহার

পোষাইয়া উঠে না। মুন্না প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার নিদ্রিত স্বামীকে দেখিতে আসে, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া সাধ মিটাইয়া একবার দেখিয়া লয়, স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই আবার চলিয়া যায়। আজ মুন্নার শূন্য প্রাণের ভিতর দুঃখের উচ্ছ্বাস কি বেগে উথলিয়া উঠিয়াছে—আজ সে সামলাইতে পারিল না, ধীরে ধীরে স্বামীর পদতলে আসিয়া বসিল, স্বামীর পা দুইটি বুকের মধ্যে চাপিয়া মাথাটি নীচু করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে বলিল "মুন্নার আর যে কেহ নাই, একমাত্র স্নেহের পিতা তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। স্বামী, প্রাণ সর্ব্বস্ব—তুমি এখনো কি একবার এই অভাগিনীর মুখের দিকে চাহিবে না?

সলেউদ্দীন ঘুমের ঘোরে পা টানিয়া লইলেন—মুন্নার মাথায় পায়ের আঘাত লাগিল। মুন্না তখন অবনত মাথা উঠাইয়া ধীরে ধীরে সেই পদে চুম্বন করিল, ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত চরণ অঞ্চলে মুছিয়া একবার সমস্ত হৃদয়ভরে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া, একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর মনের ব্যথা মনে চাপিয়া, চখের জল চোখে রাখিয়া গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাগন্ত স্বপ্ন।

মহম্মদ মসীনের সকালে সন্ধ্যায় নিয়মিত দুইটি কাজ ছিল, সকালে কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন, সন্ধ্যাবেলা কিছুক্ষণ সঙ্গীত চর্চ্চায় কাটাইতেন। কিন্তু কয়দিন হইতে এসবে তাঁহার যেন ঢিলটান পড়িয়াছে, ব্যায়াম করিতে ত প্রায়ই সুবিধা হইয়া উঠে না, গানের মজলিসটা নিয়মিত বসে বটে, কিন্তু তাহাও তেমন আর জমাট বাঁধে না। গায়ক ভোলানাথ যে গান করিতে যান মসীন তাহাই অপসন্দ করিয়া বসেন। "ভোলানাথ বাহারে আর তেমন কড়ামিঠে লাগাইতে পারেন না," "তাঁহার বেহাগে কড়িমধাম ফুটে না," "ইমনগুলা কড়িমধ্যমের জ্বালায় ঘ্যানর ঘ্যানর করে," এইরূপে কোন গানই মসীনের মনের মত হয় না। তাঁহার জ্বালায় ভোলানাথও তিতবিরক্ত হইয়া, ক্রমে সত্যসত্যই গানের বদলে কান্নার সুর ধরিয়া বসেন, রাগ গুলা বিরাগ করিয়া তুলেন, বেগতিক দেখিয়া বন্ধুরা একে একে উঠিয়া যায়, ভোলানাথও তানপূরাটাকে আছড়াইতে আছড়াইতে রাখিয়া চলিয়া যান, যত রাগ তাঁহার তানপূরার উপর আসিয়া পড়ে।

এরূপ করিয়া ত আর ভোলানাথের প্রাণ বাঁচে না,

ভোলানাথের বয়স কাঁচা না হইলেও মনটা বড় কাঁচা, প্রাণটা বড় সখের, গায়কদিগের প্রাণের ধর্ম্মই বুঝি এই-রূপ। বনের পাখীর মত হাসিয়া গান গাইয়াই এ প্রাণ কাটাইতে চাহে। মহম্মদের বেখোস মেজাজ, তাঁহার বড়ই খারাপ লাগে, মহম্মদ যে বিষন্ন আনমনে বসিয়া বাহারকে বেহাগ বলিয়া খুঁৎ ধরিয়া বসেন, গান না শুনিয়া গানের সমালোচনা করিতে থাকেন, তাহাতে বৃদ্ধ ভোলা-নাথ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যতক্ষণ না ইহার প্রতিবিধানের একটা উপায় দেখিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণটা সুস্থ হইতেছে না।

আজ আহারান্তে মসীন সন্ধ্যার পর মজলিসস্থলে আসি-বামাত্র ভোলানাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বাতাসটা আজ যেন দক্ষিণদিক থেকে বইতে সুরু করেছে, একটা সময়-মাফিক গান গাইলে হয় না?"

মসীনও হাসিয়া বলিলেন—"ওস্তাদজি দক্ষিণে বাতাস কোথায় পেলে? মহা উত্তরে বাতাস! আমরাত মারা গেলেম।"

ওস্তাদজি মুস্কিলে পড়িয়া চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—'আজ্ঞে বলেন কি? এখনো উত্তরে বাতাস? এ বুড়হাড়ে সে বাতাস লাগলে যে আর উঠতে পারব না"—

মসীন বলিলেন "তোমার প্রাণের ভিতর যে সারাদিন বসন্ত বাতাস বইছে, উত্তরে বাতাস কি তোমাকে ছুঁতে সাহস করে ওস্তাদ জি"

ভোলানাথ হুঁ হুঁ করিয়া একটু হাসিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন—"বাতাস বইছে আর কই, প্রাণের ভিতর আটকা পড়ে গেছে"

মসীন বলিলেন—"তা আটকা পড়বার আবশ্যক কি, বহুক না যত পারে বহুক, গান টান কি হবে চলুক"—

ভোলানাথের প্রাণের মত কথা হইল, মহা আহ্লাদে একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কিন্তু হুজুর আপনার আকাশ পানে চেয়ে থাকলে চলবে না, এই দখিনে বাতাসটা গায় লাগান চাই"—

মসীন বলিলেন "যে আজ্ঞে ওস্তাদজি—তাই হবে।"

ক্রমে মহম্মদের বন্ধু বান্ধবগণ একে একে মজলিসে আসিয়া বসিলেন, ভোলানাথ তানপূরা লইয়া বসন্ত বাহারের রাগ ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন, ভোলানাথ আগে হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে কিছুদিন আর গান ধরিবেন না।

সপ্তসুরে ছুঁইয়া, ছুইয়া, মধ্যম হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে সপ্তমে, সপ্তম হইতে সপ্তমে সে তান উঠিতে পড়িতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে উঠিয়া পড়িয়া সুরে সুরে মিলিয়া

মিশিয়া, মধুর মধুভাবে সে তান চারিদিক ভরিয়া তুলিল। সে তানে মলয়ের হিল্লোল উঠিল, কোকিলের কুজনি ছুটিল, তানে তানে, প্রাণে প্রাণে নব বসন্তের ফুল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

মহম্মদ কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত জগৎ ভুলিয়া গেলেন সুখের প্রবাহ ঢালিয়া অবিশ্রান্ত অবিরত সেই মধুর তান মাত্র তাহার প্রাণে গিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, ফুলের বাতাসের মত হৃদয়কে মত্ত করিয়া দিয়া ক্রমে সে তান তাহার প্রাণের দিগন্তে গিয়া মিলাইয়া পড়িল, সে তানের ঝঙ্কারও আর তিনি শুনিতে পাইলেন না। দেখার অতীত, শোনার অতীত, ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত অস্পৃষ্ট কি এক অপূর্ব্ব-ভাবে শুধু হৃদয় পুরিয়া গেল। সহসা শত শত আলোক ছটায় ফুটিয়া, চারিদিক আলোকে আলোকে ছাইয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপে সে ভাব তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল, বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মসীন সেই আলোক-ছটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই জ্যোতির উচ্ছ্বাস মধ্যে যেন একটি ছায়া ভাসিয়া উঠিল. ক্রমে সে ছায়া একটি অস্পষ্ট ছবির আকার ধারণ করিল, মসীন অনিমেষনেত্রে সেই ছবি দেখিতে লাগিলেন, ছবি অতি অস্ফুট, অতি ভাস ভাস, তাহাকে চেনা যায় না, তাহাকে চোখে ধরা যায় না, দেখিতে দেখিতে তাহা কিছু পরিস্ফুট হইল, সে ছবি একটি রমণী মূর্ত্তি; সে মুখে পাপ তাপের মলিনতা নাই,

দুঃখ বিষাদের রেখা মাত্র নাই, স্বর্গীয় শান্তিভাবের সে মূর্ত্তি জীবন্ত প্রতিমা। মহম্মদ তাঁহাকে চিনি চিনি করিয়া আকুল হইলেন, সহসা চারিদিকের আলোকছটা ছবির উপর নিক্ষিপ্ত হইল, সে আলোকে মুন্নার শান্তিময়ী প্রতিমা জ্বলিতে লাগিল। সে প্রতিমার কাছে আর একজনকে মসীন দণ্ডায়মান দেখিলেন, তিনি সেই সন্ন্যাসী।

নিস্তব্ধে স্থির কটাক্ষে মহম্মদ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সঙ্গীত থামিল, মসীনের যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, নিমেষে সেই আলোক, সেই ছবি মিলাইয়া গেল, তিনি বুঝিলেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সেদিনের মত গানের মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল, মসীন মুন্নার কাছে গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভাই বোন।

মুন্নার পিতা গিয়া পর্য্যন্ত মুন্না বড় মুষড়িয়া পড়িয়াছে, তাহার সুখশান্তি যেটুক অবশিষ্ট ছিল, যেন সকল চলিয়া গিয়াছে। মুন্নার জন্য মহম্মদ বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কি করিয়া তাহার হৃদয়ে শান্তি দিবেন ভাবিয়া পাননা, কতবার কাজকর্ম্মের মধ্যে ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাকে দেখিতে আসেন, না খাইলে জোর করিয়া খাওয়াইতে বসেন, বিষণ্ন দেখিলে হাসাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহার অসীম স্নেহে মুন্নার প্রাণের যত অভাব পূর্ণ করিতে চাহেন।

তাঁহার জ্বালায় মুন্নারও না খাইলে না হাসিলে চলে না, মুন্না না খাইলে মসীন খাইবেন না, মুন্না না হাসিলে অবশেষে তিনিও বিষণ্ন হইয়া পড়িবেন। এইরূপে জোর করিয়া কষ্টের ভাব তাড়াইতে গিয়া শেষে মুন্নার বিষন্ন প্রাণেও যখন প্রফুল্লতার ছায়া আসিয়া পড়ে, মসীনের অনন্ত স্নেহের ছায়ায় তাহার প্রাণের শ্রান্তি যখন মুহূর্ত্তের জন্য দূরে চলিয়া যায়, তখন মসীনের হৃদয় আনন্দে এতদূর উথলিয়া উঠে, যে তাঁহার হৃদয়ের সেই আনন্দ তরঙ্গ মুন্নার হৃদয় পর্য্যন্ত আসিয়া স্পর্শ করে, মসীনের অকৃত্রিম র্ণপূ মমতার সেই প্রশান্ত-আনন্দালোক প্রভাত সূর্য্যের

রশ্মির মত ছড়াইয়া পড়িয়া মুন্নার শুষ্ক ম্লান মুখেও তখন ধীরে ধীরে হাসি ফুটায়।

রাত্রে প্রতিদিন মুন্নাকে বিছানায় যাইতে দেখিয়া তবে তিনি চলিয়া যান, কি জানি তাহা না হইলে মুন্না যদি না শুইয়াই রাত কাটায়। মুন্না বিছানায় শুইলে তিনি দ্বারে আসিয়া খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকেন, যতক্ষণ না মনে হয় মুন্না নিদ্রার কোলে বিশ্রাম পাইয়াছে ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন। স্তব্ধ নিশীথিনী ঝাঁঝাঁ করিতে থাকে, খোলা বারান্দা দিয়া তাঁহার চোখের উপর রাশি রাশি তারা জ্বলিতে থাকে, তিনি তাহার দিকে চাহিয়া তখন মনে করেন যদি সকালে উঠিয়া মুন্নার মুখখানি ঐ তারাগুলির মত হাসি হাসি দেখিতে পান? এই ইচ্ছায় তাঁহার নিরাশ-হৃদয়ও তখন আশা পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু সকালে আসিয়া যখন আবার মুন্নার সেই একই রকম শুষ্ক-মলিন ভাব দেখিতে পান, তখন অতি কষ্টে তাঁহার চোখের জল থামাইতে হয়। কাজকর্ম্মে, শয়নে স্বপনে মসীনের কেবল যেন এই এক ভাবনা কিসে মুন্নাকে সুখী করিবেন, কি করিয়া মুন্নার মুখে হাসি ফুটবে। তাই বুঝি আজ সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া জাগিয়া মসীন সেইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন? বাসনার মায়ায় মুন্নার শান্তিময়ী প্রতিমা তাঁহার চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল?

স্বপ্ন দেখিয়া মহম্মদের হৃদয় আশায় সতেজ হইয়া উঠিল,

তিনি আকুলি ব্যাকুলি করিয়া মুন্নার সেই ছবি দেখিতে আসিলেন,—কিন্তু আসিয়া কি দেখিলেন, যেন মুন্না কাঁদিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিল। মসীনের নিরাশ হৃদয়ের অন্তস্তলে তখন এই কথাগুলি ধ্বনিত হইল—"ভগবান, বিশ্বপাতা, এখনো কি এ হৃদয় স্বার্থ শূন্য হয় নাই? এ ভালবাসায় এক জনেরও অশ্রুজল মুছাইতে পারিলাম না প্রভু।"

একটি কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে মসীন মুন্নার কাছে আসিয়া বসিলেন—অন্যদিন হাজার কষ্ট থাকিলেও না হাসিতে হাসিতে মসীন গৃহে প্রবেশ করিতেন না, আজ আর তাহা পারিলেন না, বড় আশা করিয়াছিলেন, তাই নিরাশ হইয়া প্রাণে বড় ব্যথা বাজিয়াছে।—তাঁহার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া মুন্না আস্তে আস্তে বলিল—"মসীন কিছু কি হয়েছে"?—মসীন হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন "না মুন্নি' কিছু না"।

মুন্নার সে কথায় বিশ্বাস হইল না, মুন্না বুঝিল, মসীনের কি কষ্ট। মুন্নার প্রাণের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, মুন্না চুপ করিয়া রহিল।

"সংসারে এমন হৃদয় ঢালা নিঃস্বার্থ স্নেহ কে কাহাকে দিয়া থাকে, এমন সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী কে কাহার আছে? এ অকৃত্রিম স্বর্গীয় স্নেহের প্রতিদান মুন্না কি দিল! মসীন তাহার কাছে আর কিছু চাহেন না তিনি

কেবল তাহার হাসিমুখ দেখিতে চান, কিন্তু অভাগী মুন্না এমনি সুখশান্তিহীন হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছে যে প্রাণ দিতে পারে কিন্তু মসীন যাহা চান তাহা দিতে পারে না। যদি সংসারের একজনকেও সে সুখী করিতে পারিল না, কেন তবে মুন্নার মরণ হয় না, বিধাতা কেন তবে, কি উদ্দেশে তাহাকে তুমি এ সংসারে পাঠাইলে ?”

মুন্না দেখে মসীনের স্নেহ অসীম, তাহার স্নেহ অতি ক্ষুদ্র, মসীনের হৃদয় নিঃস্বার্থ, তাহার হৃদয় স্বার্থভরা। ক্ষুদ্র-প্রেম হৃদয় ধরিয়া সে তবে অনন্তপ্রেমের প্রতিদান কি করিয়া দিবে ? স্বার্থভরা হৃদয় লইয়া নিঃস্বার্থ হৃদয়কে সুখী করিবে কি করিয়া ? সে আরো মসীনের শুভ্র নির্ম্মল প্রাণের সুখ আপনার স্বার্থের মলিনতা দিয়া দিন দিন ঢাকিয়া দিতেছে, তাহার অশান্তির আঁধার দিয়া মসীনের চিরহাসিময় প্রাণের শান্তি নষ্ট করিতেছে। মুন্না যতই এইরূপ করিয়া ভাবিয়া দেখে তাহার আপনার উদ্দেশ্যহীন ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি ততই বিষম ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয়, বাঁচিতে আর একটুও ইচ্ছা থাকে না।

ভাইবোনে দুজনে মনে আঁধার লইয়া নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে মসীন বলিলেন “রাত হয়েছে মুন্না শুবি নে ?” মুন্না বলিল “হাঁ যাই”। সে আর যেন কিছু বলিতে পারিল না, একটু পরে উঠিয়া শুইতে গেল, মসীন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বাহির বাটীতে আসিয়া আর মহীনের শুইতে ইচ্ছা হইল না, তখন রাতও অধিক হয় নাই, তিনি রাস্তায় একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শান্তি।

রাস্তার জীবন্ত ভাব একেবারে নিভিয়া যায় নাই, পথ ঘাট এখনো জনশূন্য হয় নাই, দোকানে এখনো কেনা বেচার গোলমাল চলিয়াছে, রজনীর শান্তপ্রাণ শিহরিয়া দিয়া রাস্তার ধারের এক একটা বাড়ী হইতে থাকিয়া থাকিয়া পৈশাচিক হাস্যধ্বনি সবলে উত্থিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এমনি উচ্চরবে কুকুরেরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে—যেন তাহাদের পশু প্রাণে সেই ভীষণ হাস্য-চীৎকার আর সহে না। দু একজন ভিকারী রাস্তায় ভিক্ষা মাগিয়া যাইতেছে, দু একজন বা গাছতলায় বসিয়া হাত পাতিয়া করুণস্বরে পথিকের দয়া-উদ্রেক করিতেছে।

মহীন চারিদিকে চাহিয়া কোথায় শান্তি দেখিলেন না, গৃহে যে অশান্তি ফেলিয়া আসিয়াছেন, এখানেও যেন তাহাই বিরাজ করিতেছে—যেন—

"সেই সব সেই সব—সেই হাহাকার রব,
সেই অশ্রু বারিধারা হৃদয় বেদনা।"

তিনি ভাবিলেন—যদি চারিদিকেই দুঃখ—তবে কোথায় সুখ? যদি সুখ কোথায় নাই, তবে লোকে সুখ চাহে কেন? জীবনই যদি দুঃখময় তবে লোকে দুঃখে কাতর কেন? সংসার যখন দুঃখময় হইয়াছে তখন কি সুখময় হইতে পারিত না? যিনি ইচ্ছায় কীট পতঙ্গ, পশু মনুষ্য, সূর্য্য নক্ষত্র, দ্যুলোক ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি সংসার দুঃখহীন হইত না? তাহা হইল না কেন? এ দুঃখের তবে গূঢ় উদ্দেশ্য কি? কিম্বা এ দুঃখ তিনি দেন নাই, আমরা রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত বিপথে গিয়া দুঃখকে ক্রমাগত সুখ বলিয়া ধরিতে যাইতেছি। অথবা সুখ দুঃখ কিছুই নাই, আমরা মনে মনে নিজে নিজে সুখ দুঃখ গড়িয়া লইতেছি মাত্র। আমরা নিজে নিজে! সে আবার কি? আমার নিজত্ব কি সেই বিশ্বপাতা হইতে স্বতন্ত্র? তাঁহা হইতে আসিয়াছি, তাঁহাতে রহিয়াছি, তাহাতে যাইব, যদি তাঁহাতেই যাইব—তাঁহাতেই ছিলাম, আর তাঁহাতেই রহিয়াছি—তবে এ স্বতন্ত্রজ্ঞান কেন? তবে স্রষ্টার একি লীলা খেলা? এ মায়া তবে কিসের মায়া? স্রষ্টা হইতে সৃষ্টির এ স্বাতন্ত্র্য তবে কেন? কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই জন্ম, এই মৃত্যু এই সুখ এই দুঃখ? কেন এ পাপ তাপ, শোক মোহ—

কেন এ সব? সংসারের এই অনন্ত চক্রে কেন এই নিদারুণ পীড়ন?

সেই গম্ভীর তারকা খচিত নভোমণ্ডলের নীচে দাঁড়াইয়া মহম্মদ এই প্রশ্ন মীমাংসায় আকুল হইয়া বুঝিলেন—ইহা তাঁহার ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত, ঈশ্বরের অনন্ত, পূর্ণ নিয়মের কাছে—কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক তাহা অপূর্ণ জ্ঞান দিয়া কে বুঝিতে পারে? কে বলিতে পারে—এ সৃষ্টির আবশ্যক ছিল না, মঙ্গলময় পরিণামই এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে? কে বলিতে পারে এই দুঃখ তাপ সেই অনন্ত সুখ মঞ্চে উঠিবার এক একটি সোপান মাত্র নহে?

মহীন গভীর চিন্তাযুক্ত হইয়া ভিকারীদের ভিক্ষা দিতে দিতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। একটী গাছ তলায় একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে যাইতেছেন—দেখিলেন—একজন মলিন বসনা স্ত্রীলোক সেই ভিক্ষুকের কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"কিছু কি পেলে? না আজও উপবাসে যাবে?

অন্ধ ভিক্ষুক তাহার ভিক্ষার ঝুলিটি স্ত্রীলোকটির হাতে প্রদান করিল। সে শশব্যস্তে তাহার ভিতরে হাত দিয়া নাড়িয়া যখন আন্দাজ দুই তিন কুনকা চাল আর কতকগুলি কড়ি মাত্র দেখিতে পাইল তখন হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"এই আজকের সব! এতে ১০। ১২ টা আণ্ডা বাচ্ছার পেট ভরবে?—খাওয়াতে পারবিনে—তবে বিয়ে করলি কেন? ভগবান, এমন অদৃষ্ট করেও জন্মেছিলুম।"

এই বলিয়া সে অদৃষ্টকে গালি পাড়িতে পাড়িতে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল, অন্ধ বলিল—"দোহাই তোর, কাঁদিসনে; যখন বিয়ে করি,তখন কি আর কান্না হব জানতুম ছাই। তবে আর একটু বসে থাকি—"

মহম্মদের হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল—"এ কি সংসার! এই বিশাল সংসারের কোথাও কি প্রেম নাই, কোথাও শান্তি নাই! কোথাও দুঃখে দুঃখ নাই, কষ্টে মমতা নাই—কেবলি যন্ত্রণার প্রতি দারুণ উপহাস, ন্যায়ের প্রতি অন্যায় অবিচার, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, এ কি এ গূঢ় রহস্য লইয়া, যন্ত্রণা বেদনার অট্ট হাসি লইয়া পৃথিবী অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া চলিয়াছে" ?

মহম্মদ তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া স্ত্রীলোকটির হাতে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া বলিলেন—"বাছা-এই লও,এবার হইতে তোমাদের ভরণ পোষণের ভার আমি লইলাম"।

সে কথা অন্ধের কাণে সঙ্গীতের ন্যায় প্রবেশ করিল, সে স্বর অন্ধ ভোলে নাই, আর একদিন এই স্বর তাহার কাণে গিয়াছিল—এই স্বর তাহার কাণে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সে মহম্মদকে চিনিতে পারিল, আহ্লাদে কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পুরিয়া গেল—সে বলিল "জয় হোক—জয় জয়কার হোক। একবার তুমি বাবা বাঁচাইয়াছিলে, ভগবান আবার তোমাকেই পাঠাইয়া দিলেন"—ব্রাহ্মণীও পূর্ণ হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

সেই গরীব অনাথদিগের সুখের আশীর্ব্বাদে মসীনের হৃদয় এত উথলিয়া উঠিল, তাহাদের শুষ্ক মুখে হাসি ফুটাইতে পারিয়া তিনি আপনাকে এত ধন্য মনে করিলেন, এত আনন্দিত হইলেন, যে একজন সম্রাটের আলিঙ্গনেও তিনি সেরূপ কৃতার্থ হইতেন না।

মহম্মদের হৃদয় বিমল-করুণায় পূর্ণ, নিঃস্বার্থ প্রেমের আধার। ভালবাসা ছড়াইয়া করুণা বিলাইয়া সে করুণার সে প্রেমের আর তাঁহার ক্ষয় হয় না, দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় তিনি যত প্রেম ঢালেন ততই তাহা আরো বেগে উথলিয়া উঠে, আকাশ-মহা-সমুদ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের প্রেম ভাণ্ডার যেন অক্ষয় অনন্ত, দান করিয়া বিতরণ করিয়া তাহা ফুরান যায় না। এ পর্য্যন্ত ভাল বাসিয়া অন্যের কষ্ট দূর করিয়া তাঁহার আশ মিটে নাই। তিনি চান অন্যের সমস্ত দুঃখ ঘুচাইয়া ফেলেন, কিন্তু যখন দেখেন তাহাতে তিনি অক্ষম—তিনি জীবন দিলেও কাহাকে পূর্ণ সুখী করিতে পারিবেন না, তিনি ত অতি তুচ্ছ, কত শত পুণ্যাত্মা মহাত্মা অকাতরে আত্মদান করিয়াও মানুষের পূর্ণ সুখ ফিরাইতে পারেন নাই—তখনই মহম্মদের যেন শান্তি চলিয়া যায়। অন্যের সুখ দুঃখে তিনি এতটা আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়েন—যে সে সমুদ্রে নিজের সুখ দুঃখ একটি জলবিম্বের মত মিলাইয়া যায়।

মহম্মদের চিন্তা সহসা ভঙ্গ হইল—অদূরে কাহার ক্রন্দন-

শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি সেই দিক লক্ষ্য করিয়া একটী কুটীর দ্বারে উপনীত হইলেন—দ্বার খোলা দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন, একজন রোগীর শিয়রে বসিয়া একজন বৃদ্ধা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। মহম্মদকে দেখিয়া বৃদ্ধার কান্না থামিল—ব্যগ্রভাবে বলিল—"তুমি কি ডাক্তার গো, আমার ছেলেকে দেখতে এলে। একবার ফকীরজির পায়ের ধূলা নিয়া বাঁচিয়েছি, এবার তুমি বাঁচাও গো"

মহম্মদ বৃদ্ধাকে চিনিলেন। বৃদ্ধার কান্নায় রোগী বিরক্ত হইয়া বলিল—"কেবল সেই অবধি মরব মরব করতে লেগেছে—আমাকে না মেরে ফেলে কি ছাড়বি নে—"

বৃদ্ধা বলিল, "বালাই ও কথা বলিস কেন।"

মহম্মদের চিকিৎসাবিদ্যাও কিছু কিছু আসিত, গরীব দুঃখীদের দেখিবার জন্যই তিনি ইহা একটু শিখিয়া রাখেন। মহম্মদ রোগীর কাছে আসিয়া তাহার মাথায় গায় হাত দিয়া দেখিলেন। তাহার পর অঙ্গাবরণ হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া তখনি তাহাকে এ মোড়ক ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন, আর পরে কখন কিরূপে খাওয়াইতে হইবে ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ঔষধের কৌটাটি বৃদ্ধার হাতে দিলেন। তাঁহার এরূপ সাহায্য এই প্রথম নহে, অনেক দিন হইতে গরীবদিগকে এইরূপে তিনি সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। কিছু টাকা ও অল্প স্বল্প ঔষধ সঙ্গে না

লইয়া মহম্মদ রাস্তায় বাহির হইতেন না। কৌটাটি বৃদ্ধাকে দিয়া বলিলেন—

"ভয় নাই, সামান্য রোগ মাত্র। এই ঔষধেই আরাম হইবে—আমি কাল সকালে আবার ডাক্তার পাঠাইয়া দিব—"

বুড়ি বলিল—"আহা তাই বল বাছা তাই বল। আহা কি দয়ার শরীর গো আর একবার এমনি একজনের দয়া দেখেছি"

বলিতে বলিতে বুড়ি যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিল—আহ্লাদে চীৎকার করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িতে গেল, মহম্মদ হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইলেন। বুড়ি বলিল—"বাবা তুই এসেছিস বাবা, আমার অকুল পাথারের কাণ্ডারী বাবা, তুই এসেছিস—"

আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক ছিল না, বৃদ্ধার সেই সরল হৃদয়ের সুখপূর্ণ উচ্ছ্বাস মহম্মদের প্রাণে সুখের ঢেউ তুলিল। বৃদ্ধার ভগ্ন প্রাণ সবলে বাঁধিয়া যখন মহম্মদ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন তখনো তাঁহার সেই সকল দৃশ্য মনে জাগিতে লাগিল, অন্ধ, ও বৃদ্ধার সেই আহ্লাদ মনে পড়িতে লাগিল,—একটি অপূর্ব্ব শান্তির ভাবে তাঁহার হৃদয় ডুবিয়া গেল, একটু একটু করিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধা রাত্রে আর একবার ঔষধ খাওয়াইবার জন্য

যখন কৌটা খুলিল তখন আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল ঔষধের সঙ্গে কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রা রহিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

খাস-মজলিস।

সলেউদ্দীন খাঁর বৈঠকখানায় সাজসজ্জার সরঞ্জামের কিছুমাত্র ক্রটি নাই। মেজিয়ায় মসনদ-শয্যা, দেয়ালে ছবি, কড়িতে ঝাড়—এই সব যেখানকার যা তা সকলি আছে,—তবে কিনা কিছু দিন আগে যেমন মাস না যাইতে নূতন ছবির আমদানি হইত,—সপ্তাহ না যাইতে দেয়ালে নূতন রং চং আরম্ভ হইত,—দিন না যাইতে শয্যার পারিপাট্যের ধূম লাগিয়া যাইত; এখন সেই সবের মাত্র অভাব হইয়া পড়িয়াছে;—সেইজন্য এখন গৃহের শোভাও কিছু অন্য-রূপ। ঘরজোড়া বিছানার জরিগুলি ছিঁড়িয়া ঝুল ঝুল করিতেছে, তাকিয়া গুলির তূলা বাহির হইয়া চারিদিকে ফুল ফুটাইতেছে। ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরির দোলন অর্দ্ধেক খসিয়া গেছে—ফানুষের অর্দ্ধেকখানি উড়িয়া গেছে আর বাকী অর্দ্ধেকে এত ঝুল পড়িয়াছে—যে তাহার মধ্য হইতে জিনিস গুলির আকৃতি সহজে চিনিয়া লইতে পারা যায় না। দেখিলেই মনে হয় গৃহটিতে মান্ধাতার আমল হইতে সম্মার্জ্জ-নীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই গৃহের কিরূপ

অবস্থা ছিল—আজ কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! এ গৃহটি দেখিলে আর লক্ষ্মীর চাঞ্চল্যে বিশ্বাস করিবার জন্য—পার্থিব সুখের অনিত্যতা ধারণ করিবার জন্য ধর্ম্মাচার্য্যদিগের ঘোর ঘন বক্তৃতাচ্ছটা শুনিবার আবশ্যক করে না।

এইরূপ সুসজ্জিত বিলাস গৃহে—ছিন্ন মসনদের উপর পারস্য রাজবংশীয় সলেউদ্দীন বন্ধুবর্গ লইয়া মজলিসে বসিয়াছেন। সুরার গন্ধের সহিত ফুলের গন্ধ মিশিয়া—একটি নূতনসৃষ্ট অভূত-পূর্ব্ব বাসে—চারিদিক আমোদিত করিতেছে। বোঁতলের কাক খুলিবার মুহুর্মুহুঃ মধুর পটাশ-পটাশ-তাল-লয়ে মিশিয়া মিশিয়া 'লাও লাও হিঁয়া লাও' এই চীৎকার সঙ্গীত সবলে সবনে সুকর্কশ সুভগ্ন কণ্ঠে অনবরত উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাঝে মাঝে নানা সুরে, নানা তানে,—লয়ে বিলয়ে, ছাঁদে বিছাঁদে, সরুতে মোটাতে হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হোঃ হোঃ হোঃ ইত্যাদি হাসির অপরূপ সমতান সেই নিশীথের প্রাণ ফাটাইয়া অর্দ্ধক্রোশ মাৎ করিয়া তুলিতেছে। মজলিসের সবে আরম্ভ বলিলেই হয়—এখনো সকলে দিকবিদিক হারাইয়া ফেলে নাই,—গৃহে সুরাদেবীর পূর্ণ আবির্ভাব হইতে এখনো কিছু বিলম্ব আছে। সলেউদ্দীনের সবেমাত্র চক্ষুদুটি ঈষৎ ঢুলিয়াছে,—কথাগুলি এখনো এড়ায় নাই,—প্রাণটা মাতিয়া উঠিয়াছি—কিন্তু জ্ঞানটা এখনো টলে নাই। ইহাঁর ডাহিনে

বামে দুইজন খাসবন্ধু—একজনের নাম আমির, একজনের নাম কাসিম। কিন্তু নাম যাহাই হউক, মজলিসে নামের সঙ্গে তাঁহাদের বড় একটা সম্পর্ক নাই—দোস্ত বলিয়াই ইহারা এ মজলিসে বিশেষ পরিচিত। আমির একটু লম্বা আর সলেউদ্দীনের একটু প্রিয়ও বেশী, ইহার নাম বড় দোস্ত, কাসিমের নাম ছোট দোস্ত। অন্য বন্ধুগণ যে যে যেখানে পাইয়াছে বসিয়াছে। সলেউদ্দীন একবার করিয়া সুরা পাত্রে মুখ দিতেছেন—আর একবার ডাইনে বড় দোস্তের প্রতি ও একবার বামে ছোট দোস্তের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন,—বন্ধুরা যাহা বলিতেছে তাহা শুনিয়া আহ্লাদে গড়াইয়া পড়িতেছেন। একবার আহ্লাদের এত আতিশয্য হইল যে হস্তস্থিত পাত্রের সুরা এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া পাত্রটি ভূমিতে রাখিয়াই বড় দোস্তের পৃষ্ঠে হস্তের জবর আদর ঝাড়িয়া বলিলেন "দোস্তজি দিল খোয়া গেল, আর সবুর কত ?"

খানসামা তখন দোস্তজির সুরাপাত্রে সুরা ঢালিতেছিল,—দুগ্ধ দর্শনে বিড়ালের ন্যায় দোস্তজি অতি তৃষিত নয়নে সেই পাত্রের দিকে চাহিয়াছিলেন, প্রাণটা সেই পাত্রে পড়িয়া রহিল—দোস্ত বলিল—"নবাব শা কুছ পরোয়া নেই—সে সব—বান্দা—"

ইহার মধ্যে পাত্রটি পূর্ণ হইল—আর কথা শেষ করিবার সময় হইল না,— তাড়াতাড়ি তাহা লইয়া দোস্ত

উদরসাৎ করিলেন। ছোট দোস্ত ইত্যবসরে বুকে ঘা মারিয়া বলিলেন—"হুকুম হইলে গঙ্গাটা পায়ে হাঁটিয়া মারিয়া লই—আর একটা ছুলীন ঠিক করা কি ভারী কথা!"

সলেউদ্দীন ঢুলু ঢুলু নয়নে বাঁকাহাসি হাসিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন— "ক্যা বাৎ—অলহম্ দল্-ইল্লা (আল্লার তারিফ)।"

এদিকে আজিমগঞ্জ (আর একজন বন্ধু) দেখিল উহারা দুই জনেই সমস্ত বাহবাটা পাইয়া যায়—সে হোসেন খাঁর গা টিপিয়া বলিল—"আর দেরি করিলে ফাঁকিতে পড়িবি।" পাত্র শেষ করিয়া হোসেন খাঁ মস্ত এক হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল "নবাব শা, কথাটা পাড়িয়াছি আগে আমি—সেটা মনে রাখিবেন"

"নবাব শা বলিলেন—"বটে হা হা হাঃ।"—

বড় দোস্ত চোখ রাঙ্গাইয়া হোসেনকে বলিল, "আজ্ঞে বলিলেন কি?"—

হোসেন খাঁ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—যা বলিলাম তাই। নবাবশার সাদির পয়গামটা (প্রস্তাব) আমা হতেই হয়েছে।"

বড় দোস্ত রাগিয়া সলেউদ্দীনের দিকে চাহিয়া বলিল "ও কথা শুনিবেন না—ও ওকি কথা!"

ছোট দোস্ত আরো কিছু অধিক সেয়ানা, সে মুচকি হাসিয়া চোখ টিপিয়া সলেউদ্দীনের কানের কাছে সরিয়া

আসিয়া আগ্রহ-তরঙ্গিত মৃদুস্বরে বলিলেন—"কিন্তু আসল ঘটকটা কে তা বুঝিয়াছেন? সেটা আর বোধ করি বলিতে হইবে না?"—

তাহা শুনিয়া সের বলিল—"না না আমি"

আলি বলিল—'আমি'—

আলফু বলিল 'আমি'

আবদুল বলিল—'আমি'। ঘর শুদ্ধ সকলেই বলিয়া উঠিল—'আমি আমি।' এই আমির মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র আমিগুলি মহা কোলাহল করিয়া একেবারে ডুবিয়া গেল। তখন সকলে নিঃস্তব্ধ হইল—সলেউদ্দীনও আল্লা বলিয়া বাঁচিলেন। তৎক্ষণাৎ এই ঝগড়া চীৎকারের তালটা গিয়া মদের উপর পড়িল—দ্বিগুণ বলে বিগুণ বেগে লাও লাও চীৎকার উঠিল, তাহার পর মহা আক্রোশ ভরে পাত্রস্থিত সুরার উপর সকলের ঘন ঘন আক্রমণ আরম্ভ হইল—এ যুদ্ধে সকলে অন্য কথা ভুলিয়া গেল। উপরি উপরি তিন চার পাত্র টানিবার পর সলেউদ্দীন বলিলেন, "কেবল তসবীর দেখিয়া ত আর প্রাণ বাঁচে না—আসল রূপ দেখাইবে কবে?

বড় দোস্ত বলিল—"রূপ—অমনরূপ—জগৎ ভরা রূপ"

ছোট দোস্ত বলিল—"রূপ—সেত নূরমহল—মহল রোসনাই করে থাকে—লাও লাও—আর এক পেয়ালা খানসামা জি"—

বড় দোস্ত বলিল "নূর-মহল কি রে ক্ষেপা—নূর-আলম—জগৎভরা রূপ"—

হোসেন বলিল—"দোস্তরে বলিস কিরে! নূর-জেন্নত—স্বর্গের আলো"

সলেউদ্দিন গলিয়া ভাবে ভোর হইয়া মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মেরা নূরজাহান, আমার প্রাণ রোসনাই কর দিয়ারে,—লাওরে লাও সিরাজ লাও"

এখন সকলের নেশা একটু পাকিয়াছে, মজলিসটা কিছু জমিয়াছে,—খানসামা মদ আনিয়া ঢালিতে লাগিল, সলে-উদ্দীন বলিলেন—"বলি দোস্ত জি এ সাদির কথাটা ত প্রকাশ হয়নি"?—

দোস্ত বলিল "তোবা তোবা, তাও কি হয়। কেউ ভাংচি দিলে জবাব দিহি করবে কে?"

নবাব শার প্রাণটা বড় হালকা হইল—তাঁহার বড় ভয় ছিল পাছে এ বিবাহের কথা কেহ শুনিলে বিবাহটা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি আহ্লাদে বলিলেন—"ক্যা বাৎ দোস্ত জি—এমন সরেস আক্কেল আর দেখিনি। তবে এখন সাদির দিনটা হয়ে যাক।"

খানসামা সিরাজ দিয়া গিয়াছিল—তাহা এইবার সলে-উদ্দীন পান করিলেন, কিন্তু পান করিয়া তাঁহার মনে হইল তাহা সিরাজ নহে—অন্য মদ। কিন্তু এ শুভ সময়ে প্রাণ সিরাজ চাহিতেছে—তাহা না পাইলে সব যেন ব্যর্থ হইয়া

যায়, তিনি লাল চোখ আরো লাল করিয়া সিরাজ সিরাজ করিয়া মহা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, চাকর গতিক মন্দ দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"সিরাজ নাই ফুরাইয়াছে"—

সলেউদ্দীন 'জাহন্নম' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দোস্ত বলিল "নবাব শা কুছ পরোয়া নেই—দুরোজ যাক্ সিরাজে ঘুমাইয়া থাকিবেন।"

ঘরের কথা যদিও অনেক দিন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, খানসামার কথায় তবু এখন সলেউদ্দীনের একটু লজ্জা হইল। একটু হাসিতে তাহা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"দোস্তজি যেখানেই স্ত্রীলোক সেইখানেই হিংসা, বুঝলেত? হজরৎ হাসেনকে এই হিংসার বিষে মরতে হয়েছিল আমি ত আমি। ঘরের স্ত্রীলোকটা এ বিয়ের কথাটা শুনেছে—তাই এসময় সিরাজটা আটকে প্রাণটা দমাতে চায়—তা কদিন দমাতে পারিস—দমা—তুই,—তোকে ফাঁকি দিলুম বলে—"

দোস্ত বলিল—"হাঃ হাঃ—এই—দুদিনের মধ্যে নবাবজি আমাদের নূতন দুলীনের পাশে বসবে, তখন তোর দমবাজি কোথায় থাকবে!"

হোসেন খাঁ আজিমের কানে কানে বলিল—"এইত দশা। এখানে, মদের পালা ফুরালো বলে; শীঘ্র সাদিটা দিয়ে দেওয়া যাক—তাহলে কিছু দিন আমাদের প্রাণভ'রে মদের যোগাড় হোল।"

নবম পরিচ্ছেদ।

উপায়।

ভোলানাথ কেমন করিয়া শুনিলেন, সলেউদ্দীন মুন্নাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া আর একটা বিবাহ করিবেন। ভোলানাথ দেখিলেন তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; মুন্নার আর তাহা হইলে কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না, মহম্মদেরও প্রফুল্ল মুখের হাসিটুক চিরকালের জন্য তাহা হইলে অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িবে, এ গৃহের আমোদ হাসিখুসী চির দিনের মত লোপ পাইবে, সোনার লঙ্কা শ্মশানপুরী হইবে। সমস্ত দিন শেলের মত ঐ কথা ভোলানাথের প্রাণে বিঁধিতে লাগিল। সন্ধ্যা বেলা গান গাহিতে আসিয়া মহম্মদকে দেখিবা মাত্র সে কষ্ট আরো উথলিয়া উঠিল, বৃদ্ধ ভোলানাথ যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। কিরূপে কি করিয়া আত্মসংবরণ করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া তাড়াতাড়ি তানপূরাটা লইয়া সুর বাঁধিতে বসিলেন। তানপূরাকে দিয়া তিনি সকল কাজই চালাইতে চাহিতেন, গৃহিণী মুখভারী করিলে তানপূরা তাঁহার হইয়া মানভঙ্গ করিবে; রাগ কিম্বা বিরক্তি বোধ হইলে তানপূরাকে লইয়া টানাটানি করিবেন. মনের ভাব লুকাইবার সময় বা আহ্লাদে, বিষাদে তানপূরায় দ্বিগুণ ঝনঝনানি উঠিবে, এইরূপে সুখে দুঃখে কাজে কর্ম্মে যত

ঝোঁক বেচারা তানপূরাটির সহ্য করিতে হইত। কিন্তু আজ তানপূরাটা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে বাদ সাধিতে আরম্ভ করিল—কিছুতেই আজ সে স্থরে মিলিতে চাহিল না ক্রমাগতই তিনি কান ধরিয়া তাহাকে স্থরে আনিতে চাহেন, ক্রমাগত ঘ্যানর ঘ্যানর করিতে করিতে তাহার তারগুলা পট পট করিয়া ছিঁড়িয়া পড়ে—তবু সে স্থরে মেলে না। সেই শব্দে চমকিয়া ভোলানাথ সলজ্জে সকলের মুখ পানে চাহিয়া আবার শশব্যস্তে তার চড়াইতে থাকেন। কিন্তু এরূপে আর বেশীক্ষণ চলিল না, দেখিলেন—চারিদিকে হাসির একটা রুদ্ধ উচ্ছাস জমা হইতেছে, এখনি মহাবেগে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িবে। তরবারি অপেক্ষা এই হাসির আক্রমণকে তিনি বেশী ডরাইতেন, তিনি তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে স্থরে বেস্থরে কোন রকমে তানপূরাটাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া গান গাহিতে গেলেন। কিন্তু গাহিতে গিয়াও গাহা হইল না, মুখ খুলিয়া হাঁ করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে মহম্মদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।—দৃশ্যটা এমন অদ্ভুত হইয়া পড়িল—যে মহম্মদ ভোলানাথের কাতরতা অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া হাসিয়া উঠিলেন,—তখন ভোলানাথও হাসিবার চেষ্টা করিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন,—তাঁর মনে হইল হয়ত মহম্মদের এমন হাসি আর তিনি দেখিতে পাইবেন না। ক্রমে চারিদিক হইতে রুদ্ধ হাসির উৎস খুলিয়া গেল। বন্ধু বান্ধবেরা

ঘর ফাটাইয়া হা হা করিয়া উঠিল, ভোলানাথ শশব্যস্তে তানপূরাটা ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর হোঁচট খাইতে খাইতে, তানপূরায় কাপড় ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হাসির অট্টরবের মধ্যে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার খানিকক্ষণ পর পর্য্যন্ত মজলিসে হাসির গড়রাটা বিলক্ষণ চলিল। এরূপ ব্যাপার আজ নূতন নহে, ভোলানাথ মধ্যে মধ্যে এমনি এক একটি হাসির কারখানা করিয়া থাকেন।

ভোলানাথ এদিকে বাড়ী আসিয়া খানিকটা তার ঝন ঝন করিয়া, খানিকটা মাথায় হাত বুলাইয়া খানিকটা গৃহিণীর সহিত বকাবকি করিয়া, খানিকটা শুইয়া খানিকটা বসিয়া, সমস্ত রাত ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কোন উপায়ে যদি সলেউদ্দীনের বিবাহটা বন্ধ করিতে পারেন। অনেক চিন্তার পর অনেক মাথা খাটাইয়া একটা উপায় ঠিক হইল, প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমীরখাঁর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দ্বারবন্ধ দেখিয়া মহা ডাকাডাকি হাঁকাহাকি আরম্ভ করিলেন, অনেকক্ষণ পরে একজন স্ত্রীলোক চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দ্বার খুলিয়া উত্তম মধ্যম নানা কথা শুনাইয়া বলিল—"মরতে কি আর জায়গা ছিল না—এত সকালে এখানে কেন—" ভোলানাথ অবাক্ হইয়া দশবার অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া দশবার হাত রগড়াইয়া শেষে মাথায় হাতটি রাখিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মী মেয়ে মানুষটি,

রাগ করিও না, বড় দরকার, একবার আমীরের সঙ্গে দেখা করিব"—

স্ত্রীলোকটা একটু নরম হইয়া বলিল—"সাহেবকে কি এখন দেখা পাবে, তিনি সেই ১০টার সময় উঠি-বেন"—

ভোলানাথ বলিলেন—"আমাকে যদি একটু বস-বার জায়গা দাও আমি সেই ১০টা পর্য্যন্তই বসিয়া থাকিব"—

স্ত্রীলোকটা বলিল—"তবে এস"।

তিনি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া একটি ঘরে গিয়া বসি-লেন।—কষ্টে স্রষ্টে এক প্রহর কাটিয়া গেল—আরো কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে ভাবিতেছেন—এমন সময় কাসীম আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারও আমীরের সঙ্গে কি দরকার ছিল। একটু পরে আমীর স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেন। ভোলানাথকে দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হইলেন—অভিবাদন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন "ওস্তাদজি যে, মেজাজ সরীফ ত!"

ভোলানাথ বলিলেন—"আর দোস্ত জি! তোমরা পাঁচ জনে মিলে মেজাজের দফারফা করলে, তা আবার সরীফ!"

আমির বলিলেন, "কেন কেন? এমনো কথা! আমরা আল্লার কাছে চার বেলা এজন্য নেমাজ পড়ছি'

ভোলানাথ সে কথা কানে না করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলি মীরসাহেব? পরকালটা মানা হয়ত"?

আমির বলিল, "পরকাল? হাঁ শাস্ত্রে ও কথাটা লিখ্‌চে বই কি? কিন্তু সে কথাটা এখন কেন"?

কাসিম ছোট ছোট চোখ দুটা অর্দ্ধেক বন্ধ করিয়া হুঁ হুঁ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "ওস্তাদজির বুঝি যাওয়ার বন্দবস্তটা হয়ে এসেছে?"

ভোলানাথ বলিলেন,—"আরে ভাই আমার একার নয় সে বন্দবস্ত সবার জন্যই হয়ে আছে,—তাই বলছি দোস্তজি, এরূপ কাজ কি করতে আছে, জবাবদিহির কথাটা কি ভুলে যাও।" আমির বলিল—"কি কাজটা ওস্তাদজি? জবাব দিহি কিসের?

ভোলানাথ, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "এই যে নবাব সাহেবকে মুন্না বিবির কাছ হতে ছিঁড়ে এনে আর একটা বিয়ে দিবার যোগাড় করছ—কাজটা কি ভাল হচ্ছে"? কাসীম খাঁ কর্কশ তীব্র কণ্ঠে হাসির স্বর বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই ওস্তাদজি অমন বদনাম দিওনা— আমরা ছিঁড়িনি ও অনেক দিনের ছেঁড়া"

আমির আর এক দিক হইতে বলিয়া উঠিল—"এই দোষের জবাব দিহি করিতে হইবে? শাস্ত্রেত আছে নাদি যতটা পার কর"

ভোলানাথের কথা বন্ধ হইল—বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ

পাইল—কেমন করিয়া উহাদের মাথায় এদোষের গুরুত্ব প্রবেশ করাইবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন। কাসীম বলিল—"কেন ওস্তাদজি তোমাদের শাস্ত্রে কি এরূপ সাদি লেখে না নাকি?" ভোলানাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তা কে বলছে—কিন্তু এতে যে একজনকে খুন করা হচ্ছে—সেটা কি ভাবা হয়েছে।"

কাসিম সেইরূপ নীরস কণ্ঠে হাসিয়া বলিল—"এমন খুনত আথসারই হয়ে থাকে, সেটা আল্লার বলাই আছে। কত পাখী পখালি গরু ছাগল রোজ জবাই হচ্ছে, সে খুনটা কি আর খুন নয়? তোমরাই কি সব চুপ করে আছ"?

ভোলানাথ গরুর নাম শুনিয়া শিহরিয়া রাম রাম বলিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন—"এরা সব একেবারে পাষাণ রে—এদের কাছেও আবার আসা—হা ভগবান।"

আমির দেখিল 'বুড়াকে কিছু অতিরিক্ত রকম চটান হইতেছে, অতটার কোনই আবশ্যক নাই, ভাবিল তাহা থাক্ বরং বুড়ার মনের মত কথা কহিয়া একটু মজা করা যাক্, সে আস্তে আস্তে বিনাইয়া বলিল—"ওস্তাদজি বাস্তবিকই কি এ বিবাহে ক্ষতিটা বড় বেশী? তা বুঝিলে কি আমি এমন কর্ম্মে হাত দিই?"

ভোলানাথের তখন আপাদ মস্তক জলিয়া উঠিয়াছে—সামলাইয়া কথা কহিবার সময় নাই—তিনি বলিয়া উঠি-

লেন—"ক্ষতিটা বড় বেশী! এমন ক্ষতি এ পর্য্যন্ত কথনো কোথায় ঘটে নাই?"

আমির বলিল—"তাইত সত্য নাকি? তাহলে কোন মতেই আমি এ বিবাহে থাকতে পারিনে, বলুন বলুন ক্ষতিটা কি শোনা যাক।"

ভোলানাত্থ যেন আত্মস্থ হইলেন—তাঁহার মনে হইল—তবে এখনো আশা আছে, তিনি বলিলেন—"দেখ—বিবিজি তাহা হইলে আর বাঁচিবেন না"—কাসীম বলিল "আরে তুমি যে বিবিজি বিবিজি করে পাগল হলে? মেয়েমানুষ গুলার কথা আবার কথা! শাস্ত্র কি বলে সেটা একবার বলতে হোল, মেয়েমানুষ আর পশু সমান—"

ভোলানাথ তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"রেখেদাও তোমার শাস্ত্র; অমন শাস্ত্র আমাদের হলে আমি পুড়িয়ে গঙ্গার জলে ফেলি। আমাদের শাস্ত্র কি বলে শোন—স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপ স্ত্রীতে আর শ্রীতে বিশেষ নাই'। আদ্যাশক্তি ভগবতী স্ত্রীলোকে অধিষ্ঠান—যে ঘরে স্ত্রী নাই সে ঘরে সুখ-শান্তি নাই—স্ত্রীলোকই এই কঠোর সংসারের জীবন।"

আবার ছোট দোস্তের খনখনে হাসির সুর বাহির হইল,—তারপর বলিল "বাবা! মেয়েমানুষের জ্বালায় সুখ-শান্তি সব হারিয়েছি, আমি একা না সমস্ত পৃথিবী; ও কথা আর বলো না—"

ভোলানাথ দেখিলেন তিনি উলুবনে মুক্তা ছড়াইতেছেন, তাঁহার শাস্ত্র উহারা বুঝিবে না—এমন স্থলে ও সব কথা না বলাই ভাল—তিনি বলিলেন—"আচ্ছা বিবিজির কথা ছাড়িয়া দাও—মেয়েমানুষের কষ্ট না হয় নাই বুঝিলে; কিন্তু অন্যদিক ভাবিয়াছ? বিবিজির কষ্ট দেখিলে মসীন সাহেব কি আর বাঁচিবেন?"

আমীর মুখটা গম্ভীর করিয়া ছাগলের মত ছুঁচলো দাড়ী দুলাইয়া বলিল "তাইত ও একটা বিষম কথা!"

সে সহৃদয়তায় ভোলানাথ গলিয়া গেলেন, আমীরকে তাঁহার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "তাহা হইলে দেখ কতদূর সর্ব্বনাশ! মহম্মদ অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু,—মহম্মদকে হারাইলে পৃথিবী একটি মহারত্ন হারাইবে"?

আমির বলিল "এমন রত্ন হারাইলে আর কি পাওয়া যাইবে!"—

ভোলানাথ আহ্লাদে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "তাহার পর মহম্মদের কিছু হইলে—ভোলানাথ যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিও না—তাহার মৃত্যুও নিশ্চয়। এ বৃদ্ধ মরিলে বাঙ্গালা দেশ হইতে রাগ রাগিণী একরূপ লোপ পাইল—বাঙ্গলার বহুদিনকার একটা স্তম্ভ পড়িয়া গেল—এখন বুঝিতেছ কি, এ বিবাহের ক্ষতিটা কি ভয়ানক?"

আমীর শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া মুখহেঁট করিয়া রহিল, তাহার পর অতি করুণস্বরে গম্ভীর ভাবে বলিল—

"পৃথিবীর নেমক খাইয়া এমন নেমকহারামী সয়তানের কাজ! কি কাজেই হাত দিয়াছিলাম—ওস্তাদজি কথাটা আগে বলিতে হয়।"

কাসীমও হাসি চাপিয়া বলিল "ওস্তাদজি আজ হইতে তুমি আমার গুরু হইলে তোমার নামে দুই বেলা খোৎবা পড়িব।—কাহারো উপদেশ এমন হৃদয় স্পর্শ করে নাই।" আমির বলিল—"যা হবার হইয়াছে ভাই এস এখন হাত গুটান যাক—উঃ ওস্তাদজির প্রাণের উপর পর্য্যন্ত ঘা পড়ে,—কালই বিবাহটা ভাঙ্গিয়া দিব,—এমন কাজও করে—"

ভোলানাথের সরল প্রাণ তাহাদের কথায় একবার মাত্র অবিশ্বাস করিল না—ভোলানাথ জানেন মানুষ না বুঝিয়া দোষ করে,ভোলানাথ জানেন মানুষ যত কেন নিষ্ঠুর,পাষাণ, পাপী হউক না তাহাদের হৃদয়ের এমন কোন না কোন ভাল অংশ আছে যেখানে ঘা দিতে পারিলে—পাষাণও কোমল হয়—পাপীও অনুতপ্ত হয়,—ভোলানাথ ভাবিলেন—তিনি আজ তাহাদের সেই নিভৃত তারে ঘা দিয়াছেন। ভোলানাথ আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিলেন—তাঁহার বক্তৃতা শক্তি যে এতদূর কাজ করিবে—তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না,—তিনি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ইহার পর ঝাড়া একঘণ্টা ধরিয়া জন্ম মৃত্যু পাপ পুণ্য—ইহকাল পরকালের

বক্তৃতা দিয়া তাহাদের অনুতাপ-দগ্ধ ভস্মীভুত হৃদয়কে পুনর্জীবিত করিয়া সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নিজের উপর তাঁহার তখন এতটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে—প্রাণ এতটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে—যে পথে যদি কোন পাপী তাপীর উপর বক্তৃতা ঢালিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন এই ইচ্ছায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, গান করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাজ নহে তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ আশাটা পূর্ণ করিবার কোনই সুযোগ দেখিতে পাইলেন না। তখন যদি এখনকার মত 'গতিমতি সঞ্চারিনী'—'চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদায়িনী' প্রভৃতি কাগজ-জোড়া লম্বা নামের সভা সমিতি বিরাজ করিত, কিম্বা 'অতি সস্তা'! 'অতি উৎকৃষ্ট'! খবরের কাগজের ধূমে রাস্তা ঘাট গলি ঘুজি ধূমায়িত হইত তাহা হইলে অতি সহজেই এ আশাটা তাঁহার মিটিতে পারিত। কিন্তু ভোলানাথ অগত্যা তাঁহার উপস্থিত বক্তৃতা-উৎস পাপী তাপীর ভবিষ্যৎ পরিত্রাণের জন্য হৃদয়ে রুদ্ধ রাখিয়া, বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ী পা দিয়াই মনে পড়িল—আসিতে যে বেলা হইয়া গিয়াছে গৃহিনী না জানি কিরূপ ভাবে বসিয়া আছেন। তখন বক্তৃতার কথা মন হইতে একেবারে ধুইয়া গেল,—আস্তে আস্তে গৃহিনীর মান ভাঙ্গান সাধের টপ্পাটি গাহিতে গাহিতে ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—

কত দূরে থেকে অধীর হয়ে,
ছুটে এল মলয় বায়।
কেন গো, গোলাপ কলি, মুখটি তুলি,
তার পানে না ফিরে চায়?
আসছে বায়ু সাড়া পেয়ে,
বোঁটায় সে যে পড়লো নুয়ে
হাসিটি ফুটতে গিয়ে কেন হোল অশ্রুময়?
মলয় তার কাছে এসে,
আদর করে হেসে হেসে,
উঠলো না সে, সে পরশে
ঝরে ঝরে পড়ে যায়।
আকুল প্রাণে তারে বালা
ডেকেছে সারা-বেলা,
এল বায়ু সাঁজের বেলা—
সে—অভিমানে মরে যায়।
ছিল বালা ফোটার আশে,
ফুটতে ফুটতে ফুটলো না সে
মলয় বায়ু আকুল-প্রাণে করে শুধু হায় হায়!

দশম পরিচ্ছেদ।

কথাবার্ত্তা।

নিস্তব্ধ নিশাকালে জ্যোৎস্নাময়ী তটিনীতটে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী মহম্মদের কথার উত্তরে কহিলেন—"ইহজন্মের কর্ম্মেই যে কেবল এখানকার সুখদুঃখ ভোগ এমন নহে। একটি হিন্দু শাস্ত্রের কথা মনে পড়িল—"কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টা-দৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ" কর্ম্মবীজ দুই প্রকার—এক বর্ত্তমান-শরীর দ্বারা কৃত, অপর জন্মান্তরীয় শরীর দ্বারা কৃত।"

মহম্মদের প্রশস্ত ললাটে সহসা রেখা পড়িল—ভ্রুদ্বয় কুঞ্চিত হইল, মহম্মদ মুসলমান, তিনি জন্ম পুনর্জন্ম হিন্দু-শাস্ত্রের একটা অলীক কল্পনা মাত্র মনে করিয়া আসিয়াছেন, বাল্যকাল হইতে এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে—সহসা সন্ন্যাসীর মুখে—যাহাকে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে দেব-তুল্য বলিয়া জানেন—তাহার মুখে একথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া পড়িলেন—কেবল আশ্চর্য্য নহে, হৃদয়ে যেন আঘাত লাগিল। এ আঘাতের অনুভব স্থল মনুষ্যের হৃদয় নহে, মনুষ্যের অহঙ্কার, এ বেদনার জন্মস্থান মনুষ্যের অজ্ঞতা। আমি যাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানি সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি না—তাহা সত্য হইতে পারে মনে করিতেও বুঝি মনে আঘাত লাগে। বুঝি মহম্মদের সেইরূপ মনে হইল; বুঝি যাহা মিথ্যা বলিয়া জানেন—তাহা সত্য

হইবার একটা সম্ভাবনা অজ্ঞাত ভাবে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-বিশ্বাসের মূল সহসা নড়াইয়া দিল—তাই এই আঘাত অনুভব করিলেন। তাহা নহিলে কথাগুলি তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইত—হৃদয় স্পর্শই করিত না। আসল কথা সন্ন্যাসীর মুখে এ কথা না শুনিলে মহম্মদ এ বিষয় চিন্তারও অযোগ্য মনে করিতেন।

মহম্মদ কিছু এত কথা তলাইয়া বুঝিলেন না—তিনি তাঁহার বিস্ময়-স্থির বৃহৎকৃষ্ণতারাবিশিষ্ট নেত্র-যুগল সন্ন্যাসীর প্রশান্ত নেত্রে স্থাপিত রাখিয়া বলিলেন "আপনি কি হিন্দু? হিন্দুরা একথা বলিয়া থাকে বটে—কিন্তু আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেত একথা নাই।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—"কি করিয়া বলিব আমি হিন্দু—,কি করিয়াই বা বলিব আমি হিন্দু নহি! সকল ধর্ম্মের সত্যই আমার নিকট সমান পূজ্য, সকল ধর্ম্মের মিথ্যাই আমার সমান বর্জ্জনীয়; সুতরাং আমার বংশের ধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন; এখন আমাকে তুমি হিন্দু মুসলমান সবই বলিতে পার। কিন্তু সে যাহাহৌক, মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রে ভিন্ন আর কোথায় কি সত্য থাকিতে পারে না? সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই যে সকলরূপ সত্য থাকিবে এমন কথা কি? শাস্ত্র এক একজন মহাত্মার ধ্যান-চিন্তার ফল মাত্র—সুতরাং সকল মহাত্মার চিন্তার বিষয় যে এক হইবে—এমন নহে, এবং এক হইলেও সকলে

যে সমান ফল পাইবেন তাহাও নহে। চিন্তাশীলতা ধ্যান-শীলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি যেপথ দিয়া সত্যকে ধরিতে পারা যায়—সকল শাস্ত্র-প্রণেতার পক্ষেই তাহা সমানরূপে আয়ত্ত করা অসম্ভব? সুতরাং শাস্ত্র প্রণেতামাত্রেই যে অভ্রান্ত বা পূর্ণ-সত্যের অধিকারী এরূপ বিশ্বাস অসংগত। ইহার উপর আবার শাস্ত্রে অনেক সত্য এরূপ রূপক-অবস্থায় আছে—যে সাধারণের পক্ষে তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাও সহজ নহে। যেমন দেখ কোরাণে বর্ণিত আছে—সকল মনুষ্যকে একদিন আবার সশরীরে তাহার কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার জন্য গোর হইতে উঠিতে হইবে—ইহার যথার্থ অর্থ যে পুনর্জন্ম তাহা কয়জন বুঝিয়া থাকে?"—

ম। "যাহা বলিলেন—তাহা সত্য হইতে পারে, এক-শাস্ত্রে যাহা নাই অন্য শাস্ত্রে তাহা থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু কেবল শাস্ত্র বলিয়াছে বলিয়াই ত কিছু বিশ্বাস করা যায় না—বাস্তবিক পক্ষে জন্ম-পুনর্জন্মের যুক্তি কোথায়? যাহার যুক্তি দেখিতে পাই না, যাহার কোন প্রমাণ নাই তাহা বিশ্বাস করিব কিরূপে?"

লোকের দুর্ব্বলতা দেখিয়া যদি সন্ন্যাসীর হাসি আসা সম্ভব হইত তবে একথায় হাসিতে পারিতেন। এই মাত্র মহম্মদ বলিতেছিলেন—মুসলমান শাস্ত্রে যাহা নাই, তাহা কি করিয়া সত্য হইবে কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের বেলায় তাঁহার মনে হইল—শাস্ত্রে যাহা থাকে তাহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে?

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ইহার যুক্তি অবশ্যই আছে—তাহা দেখাইতে আমাকে দূরে যাইতে হইবে না। ভাবিয়া দেখ একেবারে 'কিছুনা' হইতে 'কিছু' হইতে পারে না,—সুতরাং যে তুমি আজ আছ, কাল অবশ্যই ছিলে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।—বিশ্বের নিয়মই এই, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা কোন কালেই ছিল না, তাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হয় না, এবং যাহা সৎ, যাহা আছে তাহার বিনাশ নাই, এক কথায় প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, রূপান্তর হইতে পারে মাত্র—সুতরাং বস্তু মাত্রেই অনন্ত-অতীত, অনন্ত-ভবিষ্যতের সহিত বাঁধা ইহার অন্যথা নাই। এই খানে আর একটি হিন্দু শাস্ত্রের কথা উদ্ধৃত করি।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম। যাহাকে আমরা যথা ক্রমে অতীত ও অনাগত অর্থাৎ মরিয়াছে নষ্ট হইয়াছে এবং হইবে ও জন্মিবে বলিয়া উল্লেখ করি—বাস্তবিক পক্ষে তাহার প্রকৃতরূপ যাহা তাহা থাকে—কেবল তাহাদের ধর্ম্ম, গুণ বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়।"

ম। "তাহা আমি অবিশ্বাস করি না, আজ আমি যে শক্তি হইতে উৎপন্ন সেই শক্তি যে অনন্তকাল বিরাজিত তাহার সন্দেহ নাই—কিন্তু এই সুখদুঃখ-অনুভবশীল জীববেশধারী আমি যে আগেও ছিলাম তাহা কি করিয়া জানিব।"

স। "প্রকৃতি পাঠ করিয়া দেখ শক্তি কি নিয়মে কাজ করে, তাহা হইলে আপনা হইতেই এ প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

শক্তি যেমন অবিনশ্বর—শক্তির কার্য্যও তেমনি নিয়মাধীন। কোন বিশৃঙ্খল অনিয়মে শক্তি কার্য্য করিতে পারে না—যে নিয়মে শক্তি কার্য্য করে—তাহার নাম ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি। আকৃতিও এই নিয়মের অধীন, প্রজাপতি একটি ইহার সামান্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিলে বুঝিতে পারিবে জগতের সমস্ত পদার্থেরই এই এক লক্ষণ। নিকৃষ্ট সোপান দিয়া না উঠিয়া একেবারেই উৎকৃষ্ট জীব উদ্ভাবন হইতে পারে না। এই নিয়ম স্থূল সূক্ষ্ম উভয় জগতের পক্ষেই এক; কারণ প্রকৃতির মূল-নিয়ম বিশ্বব্যাপী; তাহা একটিতে একরূপ—অন্যটীতে অন্যরূপ হইতে পারে না। বস্তুতঃ পক্ষে স্থূল সূক্ষ্মের বস্তুগত প্রভেদ নাই—একই শক্তি স্ফূর্ত্তির তারতম্য হেতু ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা যাহাকে জড় বলি তাহাতেও চৈতন্য আছে—তবে সেখানে তাহা ফুটিয়া উঠে নাই—মানুষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন একটি গোলাপ কলি ও ফুটন্ত গোলাপ উভয়েই ফুল, সেইরূপ জড় ও জীব উভয়েই চৈতন্যময়। শরীরগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্তর-নিহিত চৈতন্যেরও ক্রম-বিকাশ চলিয়াছে, নহিলে কেবল আকৃতির উন্নতিতে কি কাহাকে যথার্থ উন্নতজীব বলিতে পার? এই উন্নতির সোপানে উঠিবার জন্যই—গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে, আকৃতির পর আকৃতি—জন্মের পর জন্ম, অবস্থার পর অবস্থা। এ নিয়মের

অন্যথা করিয়া কোন শক্তিপুঞ্জ একেবারে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য রূপে বিকাশ পাইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্র পড়, দেখিতে পাইবে উদ্ভিদ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সমস্ত জাতি ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্য এই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াছে। এক শ্রেণীর পদার্থের উন্নতির শিখরে আর একটি উন্নততর পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহিলে প্রকৃতির নিয়মের যেমন সাম্য থাকে না—সৃষ্টিরও তেমনি পূর্ণ অর্থ থাকে না"।

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী এক মুষ্টি ধূলি হাতে লইয়া বলিলেন "এই যে দেখিতেছ ধূলিরাশি, তুমি মনে করিতেছ ইহা হইতে তুমি কত উচ্চ—তোমার মত জীবের পদতলে থাকিয়া তোমার কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করাই এধূলার উদ্দেশ্য। কিন্তু গর্ব্বিত মানব তুমি কি ভ্রান্ত! এই প্রত্যেক ধূলি-কণা তোমার মত উচ্চ মানব হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আর এইরূপ এক একটি ধূলিকণা হইতেই তোমার আমার জন্ম হইয়াছে। প্রত্যেক মৃত্তিকা-অণু, উদ্ভিদ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষীর অন্তর নিহিত চৈতন্যের বা শক্তির উন্নতির সোপানে তুমি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমিই উন্নত হইয়াছ আর সকলে পড়িয়া থাকিবে তাহা মনে করিও না, তাহা হইলে এ সকল সৃষ্টির অর্থ থাকে না—যখন যুগযুগান্তর পরে তুমি মানুষ হইতে উচ্চ ভাবে পরিণত হইবে, তখন হয়ত, আজিকার এই ধূলিমুষ্টি মনুষ্যাকৃতির প্রথম সোপানে পদবাড়াইবে"—

কথা শেষ করিয়াই সন্ন্যাসী বুঝিলেন তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্ততা হইতে উৎসাহে কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন—মুহূর্ত্তে আত্ম সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"দেখ বৎস সংসার পানে চাহিয়া দেখ জীবনের অপরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাইবে। কেহ জন্মাবধি কুসুম শয্যায় লালিত পালিত, কেহ এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, কোন সুকুমার-রূপগুণশালী জগৎ মোহিত করিতেছে, কোন বিকৃত-কায়মন অন্যের ঘৃণা উদ্রেক করিতেছে—পাপের মধ্যে কাহারো জন্ম বৃদ্ধি, কেহ পুণ্যময় গৃহে পুণ্যময় জীবন লইয়া জন্মিয়াছে। ইহারা ত কেহই বর্ত্তমান জন্মে নিজের দোষে বা গুণে এরূপ কষ্টের বা সুখের অধিকারী নহে—কেন বৎস তবে এরূপ ঘটনা? দেখ এক পিতামাতার সন্তান হইয়া, একরূপ অবস্থায় লালিত পালিত হইয়াও দুই জনের মধ্যে কত তফাৎ, একজন রূপবান গুণবান, আর একজন কুশ্রী নির্গুণ। যদি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল না মান তবে আর ইহার কি কারণ দেখাইতে পার? অনেক স্থলে আমরা পিতা মাতার কর্ম্মফল সন্তানে অর্পণ করিয়া, দোষীর শাস্তি নির্দ্দোষীর ঘাড়ে ফেলিয়া এই রহস্যের ভেদ করিতে যাই,—কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা দূরে থাক আরো দুর্ভেদ্য করিয়া তুলি—প্রকৃতির নিয়মকে ঈশ্বরের বিচারকে কেবল অনিয়ম ও অবিচার করিয়া তুলি। সংসারের সর্ব্ব-

এই আমরা কার্য্য কারণের নিয়ম দেখিতেছি, মনুষ্য-সম্বন্ধেই বা তাহার ব্যভিচার কেন হইবে? বাস্তবিক পক্ষে জগতে দৈবনির্ব্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই—কঠোর অব্যভিচারী সূক্ষ্ম নিয়মের বশীভূত হইয়াই সংসার চলিতেছে, সে নিয়ম অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী রুচি বাসনা ও প্রবৃত্তি সমূহের আকর্ষণ বশে লোকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম লইয়া থাকে। যেমন চৈতন্য একটি শক্তি তেমনি কর্ম্মফলও শক্তি। চৈতন্যেরও যেমন বিনাশ সম্ভবে না কর্ম্মফলেরও তেমনি বিনাশ সম্ভবে না। তবে উভয়েরি রূপান্তর হইতে পারে মাত্র। কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে বস্তুতঃ তাহা যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ভস্ম ও ধূমাকারে পরিণত হয় মাত্র, তেমনি মনুষ্যও নিজ কর্ম্মে স্বাধীন প্রবৃত্তি রূপ অগ্নি সংযোগ দ্বারা কর্ম্মফলকে উত্তম হইতে অধমে—অধম হইতে উত্তমে লইয়া যাইতে পারে, বর্ত্তমান শুভ বা অশুভ কর্ম্ম দ্বারা জীবনের তৌলদণ্ডকে ভারাক্রান্ত করিয়া সেই পরিমাণে অতীত শুভাশুভ কর্ম্মের কার্য্য কারিতা-ভার লাঘব করিতে পারে; এবং এইরূপে ইচ্ছানুসারে আপনার সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি সাধিত করিতে পারে। মানুষের এই যে স্বাধীন প্রবৃত্তি ইহাও ক্রমবিকাশ নিয়মের অধীন। যে পরিমাণে আমাদিগের মধ্যে চৈতন্য শক্তি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, অর্থাৎ জীব যে পরিমাণে উন্নত হয় সেই পরিমাণে অল্পে অল্পে

তাহাতে স্বাধীন প্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায়, অথবা যা একই কথা—তাহার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষেত্র প্রশস্ততা লাভ করে, ভাল মন্দ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা জন্মে। সুতরাং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবের কর্ম্মের দায়ীত্বও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—কর্ম্মফলেরও সূক্ষ্ম ভোগ হয়। জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলেই মনুষ্য আবার এই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।”

মহম্মদের হৃদয় স্তম্ভিত হইল—তাঁহার বহুদিনের বিশ্বাস যে নড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা যেন প’ড় প’ড় হইয়া উঠিল, সত্য-অসত্য মিশিয়া তাঁহার মনের ভিতর যেন তোলপাড় করিতে লাগিল, তিনি বলিলেন—“তবে পৃথিবীই আমাদের পরলোক, পৃথিবীতেই আবার কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভোগ,—স্বর্গনরক সকলি তবে মিথ্যা?”

স। “না তাহাও নহে। কর্ম্ম দুই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম। আমি শরীর দ্বারা যাহা করি তাহাও কর্ম্ম—মনের দ্বারা যাহা করি তাহাও কর্ম্ম—আমাদের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক চিন্তা, ধ্যানটি পর্য্যন্ত কর্ম্ম। তবে শরীর জাতকর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা বাহ্যজগতের উপর কার্য্য করে তাহা স্থূলকর্ম্ম—এবং চিন্তা কল্পনা ইচ্ছা ধ্যান প্রভৃতি, যাহা সূক্ষ্ম জগতে কার্য্য করে তাহা সূক্ষ্ম কর্ম্ম। এখন দেহ স্থূল, সুতরাং এই দেহ লইয়া পৃথিবীতে স্থূল কর্ম্মের ভোগ যেমন কড়ায় গণ্ডায় হইতে পারে সূক্ষ্ম কর্ম্মের ভোগ তেমন গভীর-

রূপে হইতে পারে না। সেই জন্য যে সকল শাস্তি পুরস্কার পৃথিবী দিতে অপারক—মৃত্যুরপর আত্মরূপী সূক্ষ্ম-অবস্থায় তাহা কর্ম্মকর্ত্তা অতি গভীররূপে ভোগ করে। প্রকৃত পক্ষে স্বর্গ নরক কোন স্থান নহে—আত্মার একটি আত্মগত তীব্রসুখ অথবা দুঃখময় বিভোর অবস্থা মাত্র—সেই সুখ বা দুঃখ ভোগের ক্ষমতার অবসান হইলে আবার তখন পুনর্জন্ম। এইখানে আর একটি শ্লোক মনে পড়িল—

পাপ ভোগাবসানে তু পুনর্জন্ম ভবেদ্বহু,
পুণ্য ভোগাবসানে তু নান্যথা ভবতি ধ্রুবং।

পাপ ভোগের অবসানে কর্ম্মানুসারে ইহ সংসারে জীবের বহু পুনর্জন্ম হয়, সেই রূপ পুণ্যাবসানে স্বর্গচ্যুত পুণ্যকৃত পুরুষেরও বহুজন্ম হইয়া থাকে—তাহার অন্যথা হয় না।

পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র জীবন যাহা অনন্ত কালের তুলনায় এক মুহূর্ত্তও নহে, তাহার পাপ পুণ্য হইতে অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ কিরূপে হইবে!"

ম। "তবে ইহলোক পরলোক সকলি স্বপ্ন—উচ্চ লোক উন্নত লোক সকলি আকাশ কুসুম?"

স। "না বৎস প্রকৃত পরলোক উন্নত লোক—কেবল আকাশ কুসুম নহে। যতদুর উন্নতি করিতে পারিলে যতদূর বিকশিত হইতে পারিলে উন্নতির সোপান গুলি উত্তীর্ণ হইয়া একটি উচ্চলোকে পৌঁছান যায়—এক ক্ষুদ্র

জন্মে তাহা আয়ত্ত-সাধ্য নহে। জন্ম পুনর্জন্মে আমরা একটু একটু করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া—একটু একটু করিয়া মাত্র উঠিতে পারিতেছি। মনুষ্য অসম্পূর্ণ জীব, প্রতিপদে পদস্খলন করিয়া তবে একটু জ্ঞান লাভ করিতেছে, উন্নতির সোপানে একপদ অগ্রসর হইবার মধ্যে দশপদ পিছাইয়া পড়িতেছে—সুতরাং এরূপ স্থলে এক জন্মে মাত্র যদি উঠিতে হইত তাহা হইলে কোন কালেই তাহার উঠিবার আশা থাকিত না। কিন্তু অজস্র বার পড়িয়া পড়িয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যাহাতে দুর্ব্বল ক্রমে বলবান হইয়া উচ্চ সোপানে উঠিতে পারে এই জন্যই প্রকৃতিদেবী তাহাকে এই অগণিত সময় প্রদান করিয়াছেন। আজ যাহাকে পড়িতে দেখিতেছ এখনো তাহার সে অভিজ্ঞতা টুক লাভ হয় নাই এই মাত্র, একদিন তোমার আমারও ঐরূপ দশা ছিল। সুতরাং পাপীতাপী দেখিয়া ঘৃণা করিও না, সেই পাপা তাপীতে তোমারই অতীত ইতিহাস আবদ্ধ রহিয়াছে, তুমিও সেই পাপী তাপীর মধ্যে একজন,—আর কে বলিতে পারে—ঐ পাপী তাপী একদিন তোমা হইতেও উচ্চে উঠিয়া যাইবে কি না।”

মহম্মদের সম্মুখে যেন এক নূতন প্রশস্ত সত্য রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকার হইতে আলোতে আসিলে যেমন চোখে ধাঁধাঁ লাগে সেইরূপ আলোকের বিস্তৃত রাজ্যে দাঁড়াইয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখি-

লেন—সন্ন্যাসীর কথা ধারণা করিতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—সন্ন্যাসী বলিলেন—

"যেমন অগণিত যুগযুগান্তরে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে—অসংখ্য জীব রূপে ভ্রমণ করিয়া এই মনুষ্য হইয়াছ, তেমনি আবার কত যুগযুগান্তরে অল্পে অল্পে উন্নতির ক্ষুদ্র সোপানাবলীতে উঠিতে উঠিতে অন্য উচ্চ লোকের উপযোগী উন্নত অবস্থায় পৌছিবে তাহা ধারণা করাও অসম্ভব। প্রকৃত কথা এই, এই পৃথিবীর স্থূল বাসনার আকর্ষণ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেই পৃথিবী অপেক্ষা উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নত দেবলোকে গমন করিতে পারিবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হইবে—ততদিন অবশ্যই সেই স্থূল কর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত আমাদের এই স্থূল পৃথিবীতে আসিতে হইবে।

মহ। "কিন্তু কর্ম্মবিরহিত হইবার উপায় কি প্রভু।"

স। "নিঃস্বার্থ নির্লোভ হইয়া কেবল কর্ত্তব্য মনে করিয়া কর্ম্ম করিলেই মানুষ কর্ম্ম বিরহিত হইতে পারে—তৃষ্ণা-পরবশ বাসনা-পরবশ হইয়া কর্ম্ম করিলেই তাহা সকাম কর্ম্ম। যখন প্রত্যেক চিন্তাটি পর্য্যন্ত কর্ম্ম তখন একেবারে কর্ম্মহীন হওয়া মানুষের অসম্ভব—এবং তাহা প্রার্থনীয়ও নহে, কেন না তাহা যথার্থ পক্ষে কর্ম্মহীনতা নহে—কেবল জড়তা মাত্র, তাহাও একরূপ কর্ম্ম—তাহা অকর্ম্ম। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "কদাচিৎ কোন

অবস্থায় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না—অতএব সম্পূর্ণ চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি পর্য্যন্ত জাতি এবং আশ্রম বিহিত কর্ম্ম সকল অবশ্যই কর্ত্তব্য—নতুবা চিত্ত শুদ্ধির অভাব হেতু জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।" উন্নতি লাভ করিতে গেলে কর্ম্ম করাই আবশ্যক—তবে সে কর্ম্ম নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হওয়া আবশ্যক। তৃষ্ণাই সকল দুঃখের কারণ, উন্নতির প্রতিরোধক। তৃষ্ণাবিরহিত কর্ম্মই অর্থাৎ নিষ্কাম ধর্ম্মই মুক্তির উপায়। কামনা পরবশ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেও তাহার ভোগের জন্য আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া দুঃখ ক্লেশে পড়িয়া, নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয়।"

কথা কহিতে কহিতে সন্ন্যাসী দেখিলেন তাঁহাদের দিকে কে অগ্রসর হইতেছে। তিনি বলিলেন—"আজ আমি চলিলাম বৎস, আবশ্যক হইলে আবার আসিব। তাহার জন্য আর ব্যাকুল হইও না, দুঃখই অনেক সময় সুখের কারণ ইহা মনে রাখিও। আর একটি কথা, যে জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি এখনো বলি নাই তোমার মক্কা যাইবার আবশ্যক নাই, করাচী গমন করিলেই পিতার দর্শন পাইবে।"

দেখিতে দেখিতে একখানি ছায়ার মত সন্ন্যাসীর সে দেবমূর্ত্তি দিগন্তের কোলে যেন মিলাইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিত্যাগ।

মহম্মদ মসীন চালানের বাণিজ্য করিতেন। কিছু দিন হইতে তাঁহার প্রধান দুইখানি জাহাজের আর কিছু খবর পাওয়া যাইতেছে না, মাঝে ভারত উপসাগরে বড় একটা ঝড় হইয়া গিয়াছে, সকলের ভয় হইতেছে হয়ত বা মসীনের জাহাজ দুখানি মারা গেল। তাহা হইলেই মসীনকে এক রকম সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, এত দেনা হইয়া পড়িবে যে অন্য জাহাজ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব সম্পত্তি বিক্রয় না করিলে আর সে দেনা শোধ হইবে না। মসীনদের যেরূপ অসময়, তাহাতে জাহাজ ডোবাই তাঁহার যেন অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। অথচ এই কারবারেই তাঁর বুক বাঁধা, সলে উদ্দীন এক পয়সা রাখুন আর নাই রাখুন—তাহার উপর যে মুন্নার নির্ভর করিতে হইবে না, মসীনের এতদিন এই একটা মনে বিশ্বাস ছিল। হঠাৎ যেন তাঁহার সে বিশ্বাসটায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাহার এক দিক সামলাইতে গিয়া অন্যদিক খসিয়া পড়িতেছে, মহম্মদের সরলনির্ভীক প্রাণও ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় কেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে, একটা মস্ত ঘরের এক কোণে একটি ক্ষীণালোক মিট মিট করিতেছে, বিকালে বৃষ্টি হইয়াছিল,

মাঝে মাঝে ভিজা ঠাণ্ডাবাতাসের এক একটা দমকা আসিয়া প্রদীপের সেই ক্ষীণ প্রাণটাকে দারুণ বেগে কাঁপাইয়া চলিয়া যাইতেছে। বাহিরের ব্যাংগুলার ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ আর ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত সমতানে কেমন একটা বিষাদময় ভাবে কক্ষটা পূরিয়া উঠিয়াছে। মুন্না এই নিস্তব্ধ নিঃশব্দবিলাপিত গৃহের একপাশে একটা ভগ্ন বাদ্য-যন্ত্রের মত পড়িয়া আছে। এই ভাঙ্গা বাজনার তারে যত-বার ঘা পড়িতেছে কেবলি যেন বেসুরে বাজিয়া উঠিতেছে, মুন্নার মনে যাহা কিছু ভাবনা আসিতেছে সকলি যেন কষ্টের। আজ যেন আবার কি এক অস্বাভাবিক, কি এক অপরিচিত নূতনতর যাতনায় তাহার হৃদয় মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। আজ আর মহম্মদের গানের মজলিস বসে নাই, সন্ধ্যা-হইতেই তিনি মুন্নার কাছে বসিয়া আছেন, মুন্নার সেই মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া তিনি আর সকল কথা ভুলিয়া গেছেন, সংসারের আর সকল বিপদ তাহার কাছে অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ভাবিতেছেন—মুন্নার হাসিমুখ দেখিতে পাইলেই তিনি যেন শত রাজত্ব অবাধে লাভ করিতে পারেন, সংসারের সমস্ত বিপদ দুই পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মহম্মদ জানেন না কি করিয়া মুন্নার সেই মনোভার লাঘব করিবেন, মাথার কাছে বসিয়া সস্নেহে কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে আস্তে আস্তে দুই একবার দুই একটি কি কথা কহিতে

গেলেন, কিন্তু যখনি দেখিলেন মুন্নার তাহা ভাল লাগিতেছে না তখনি আপনা হইতে আবার নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল, মহম্মদ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কি ভাবিয়া তাহার পর ঘরের কোণ হইতে একটি সেতার আনিয়া বাজাইতে বাজাইতে আস্তে আস্তে গান করিতে লাগিলেন, তাঁহার বুঝি মনে হইল ক্রমে ক্রমে গানের দিকে মন আকৃষ্ট হইয়া মুন্নার কষ্ট কমিয়া আসিবে। তিনি সেতার বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিলেন মুন্না তাঁহার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার মনে হইতে লাগিল "লোকে কি করিয়া গান করে, আমোদ করে? উহাতে বাস্তবিক তাহারা কি সুখ পায়—ও ত সকলি ছেলে মানষি।"

একদিন ছিল বটে, যখন মুন্নারও গান শুনিতে ভাল লাগিত, সঙ্গীতের মধুরস্বরে মুগ্ধ হইয়া পড়িত, একটা সামান্য কথায় প্রাণের ভিতর কিরূপ সুখের উচ্ছাস বহিয়া যাইত, কিন্তু এখন যেন সে সকল ভাব ঘুচিয়া গিয়াছে, পুরাণ স্মৃতিতে যদি বা মুহূর্ত্তের জন্য একটা সুখের ভাব মনে জাগিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর কেমন একটা মোহের ভাব আসিয়া অধিকার করিতে যায়—তখনি যেন তাহা মিলাইয়া পড়ে—তাহারপর সে সকলি যেন একটা হাসির কথা বলিয়া মনে হয়। একটা গান শুনিয়া একটা শ্লোক পড়িয়া, একটা কথা কহিয়া কেন যে

এক সময় প্রাণ উথলিয়া উঠিত তাহার কারণ যেন সে খুঁজিয়া পায় না। কাহাকে যখনি হাসিতে আমোদ করিতে দেখে—মুন্নার পূর্ব্বের মনের ছায়া যখন কাহারো হৃদয়ে দেখিতে পায়—তখন অমনি অবাক হইয়া ভাবে, সবই ছেলে খেলা,—চিরদিন কি সকলে এইরূপ খেলিবে? মুন্নার বয়স কুড়ির অধিক নহে, মুন্না ইহার মধ্যেই জগৎ সংসারকে ছেলেখেলা ভাবিতে শিখিয়াছে। মুন্না যে প্রতিদিন সাংসারিক কাজ করে, খায়, শোয়, বেড়ায়, কখনো বা হাসে কখনো কাঁদে—তাহারো যেন সকল সময় সে কোন কারণ কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পায় না। যেন কাজ করিতে হয় তাই করে—হাসি আসে তাই হাসে, কান্না থামাইতে পারে না তাই কাঁদে—কিন্তু এ সকলি যেন উদ্দেশ্য হীন, অর্থ শূন্য, সকলি যেন ছেলে খেলা বলিয়া মনে হয়। মুন্নার প্রাণের ভিতর এক এক সময় এই রকম একটী অসীম গাম্ভীর্য্যের ভাব আসিয়া পড়ে—মুন্না সেই রূপ ভাবের ভিতর দিয়া এখন বিশ্বসংসারকে চাহিয়া দেখিতে-ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন মসীনের সেই সুমিষ্ট সঙ্গীতের এক একটি সুর তাহার হৃদয়ে গিয়া আঘাত দিতে লাগিল, প্রতি আঘাতে আঘাতে তাহার প্রাণের ভিতর সঙ্গীতের ভাবটুকু অল্পে অল্পে রাখিয়া রাখিয়া যাইতে লাগিল, তখন অতি ধীরে ধীরে কেমন অজ্ঞাত ভাবে মুন্নার-প্রাণের ভার যেন একটু একটু করিয়া খসিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল—যেন

মসীনের সেই গানের ইচ্ছা শক্তিতেই উত্তেজিত হইয়া মুন্নার মুখে ক্রমে একটা হাসির রেখা পড়িয়া আসিতেছিল—কে জানে কেন, বুঝি বা সহানুভূতির ভাব হইতে, বুঝি বা মসীনের সুখ মনে ভাবিয়া, মুন্নার বিষণ্ণ প্রাণের ভিতর একটা সুখের ছায়া নির্ম্মাণ হইতেছিল—বুঝিবা তাহার সহিত স্মৃতি মিশ্রিত হইয়া একদিন সেও যে মসীমের মত ছেলে মানুষ ছিল—এই ভাবিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন সেই বাল্যকাল ফিরিয়া পাইতেছিল—সেই সময় তখনি কে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল—

"তিনি চলিয়া গেলেন, গো, আর আসিবেন না—"

চকিতের মধ্যে সেতার বন্ধ হইল, গান থামিয়া গেল, স্তব্ধ গৃহের শিরায় শিরায় তখনি এই আকুল কথাগুলি চমকিয়া উঠিল—

"কে গেল—কোথা গেল—কে আসিবে না?"

দাসী বলিল "নবাবশা চলিয়া গেলেন, বিবাহ করিবেন আর এখানে আসিবেন না।"

একটি পাষাণভেদী করুণ ক্রন্দন-ধ্বনির সঙ্গে একবার মাত্র এই অস্ফুট কথা গুলি শোনা গেল—"গেলেন তিনি! চলিয়া গেলেন! একবার চাহিয়া গেলেন না! একবার দেখিয়া গেলেন না।"

তাহার পর মন্ত্রস্তব্ধ ভীষণ নিস্তব্ধতা গৃহ-মধ্যে আধিপত্য স্থাপন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একাকী।

দুই চারিদিন চলিয়া গেছে, মুন্না সেই ঘরের এক পাশে একটী বিছানায় দলিত হৃদয় লইয়া একগাছি ছিন্ন লতার মত পড়িয়া আছে! আবার সন্ধ্যা হইয়াছে, তেমনি মিট-মিট করিয়া দীপ জ্বলিতেছে, মসীন চুপ করিয়া মুন্নার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাহার ম্লান, বিশুষ্ক, নিমীলিত-আঁখি মুমূর্ষু মুখ খানির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কি যেন কি একটা অব্যক্ত যাতনা ঘূর্ণবায়ুর মত তাঁহার প্রাণের মধ্যে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সেই ঘূর্ণবায়ুর আবর্ত্তে পড়িয়া দিগ্‌বিদিক হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যাহা দেখিতেছেন যাহা ভাবিতেছেন কিছুই যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না, সকলি তাঁহার নিকট একটা ঘোর ঘন অন্ধকার দৃশ্য বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি আর কিছু মনে করিতে পারিতেছেন না, কেবল মনে হইতেছে, কি যেন ছিল কি যেন নাই, কি যেন গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। থাকিয়া থাকিয়া সে ঘূর্ণ-তরঙ্গের রুদ্ধ-উচ্ছাসে তাঁহার প্রাণ যেন রোধ হইয়া আসিতেছে, বুক ফাটিয়া মাঝে মাঝে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইয়া, স্তব্ধ গৃহটাকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। মহম্মদের তখনি যেন চমক ভাঙ্গিতেছে, তিনি

চমকিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, অস্পষ্ট ছায়া ছায়া আলোকে সেই শোকাকুল গৃহটা একটা শ্মশান-পুরীর মত যেই তাঁহার চোখে পড়িতেছে, আর অমনি যথার্থ অবস্থাটা তাঁহার যেন হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। সলে-উদ্দীনের নিষ্ঠুর জঘন্য ব্যবহার মনে করিয়া হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আবার রৌদ্রতাপে নীহারের ন্যায় সে ক্রোধ গভীরতম দুঃখে মাত্র পরিণত হইতেছে, চোখে জল পূরিয়া উঠিতেছে, তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আবার মুন্নার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিতেছেন, চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছেন—"সেদিন কোথায় গেল? যেদিন মুন্না সেই ছোট মেয়েটি—সুখের ছবিটি, বসন্তের বাতাস ছড়াইয়া, উষার আলোক সঙ্গে লইয়া, এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইত, আপনি হাসিয়া পিতার মুখে হাসি ফুটাইত, মহম্মদের গলা ধরিয়া একদৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া তাহার গল্প শুনিত গান শুনিত—সে দিন কোথায় গেল? স্নেহ প্রেম, সুখ শান্তির নির্ম্মল প্রাণের ভিতর যে দিন সূর্য্য উঠিয়া অস্তে যাইত, ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িত, পাখীরা গান গাহিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, সে দিন কোথায় গেল?

এমন কত জ্যোৎস্নার দিন গিয়াছে তাঁহারা তিনজনে একত্রে বাগানে চাঁদের আলোকে বসিয়া গল্প করিতে করিতে রজনীগন্ধা গুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, দূরে নৈশগগনে বাঁশীর তান উথলিয়া উঠিয়াছে, মুন্না কথা কহিতে কহিতে

কথনো তাঁহার কোলে কথন পিতার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহার জ্যোৎস্না-চুম্বিত সেই ঘুমন্ত হাসিটি একটী স্বপ্নদৃশ্যের মত কতদিন ধরিয়া মসীনের প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন কত দিন গিয়াছে ভাই বোনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রভাতের গোলাপ গাছে একবৃন্তে যথন ছুইটি ফুল ফুটিতে দেখিয়াছেন, সন্ধ্যার আকাশে এক সঙ্গে যথন ছুইটি তারা উঠিতে দেখিয়াছেন, তথন তাঁহার মনে হইয়াছে, উহারা তাঁহাদের মত ছুটি ভাই বোন—ঐ ফুল ছুটির মত ঐ তারা ছুটির মত তাঁহারা হাসিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন—হাসিয়া ঝরিয়া পড়িবেন।

তাহা হইল না কেন?

কে জানে তাহা হয় না কেন? সুখের প্রভাত যথন অস্তে যায়, চাঁদিনি রজনী যথন পোহাইয়া যায় তথন তাহারা হাস্যময়ী ফুলগুলিকে, জ্যোতির্ম্ময়ী তারাগুলিকে কে জানে কেন কাঁদাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়? যথন মর্ম্মান্তিক ইচ্ছা করিলেও বুকফাটিয়া মরিয়া গেলেও সে ফুলের মুখে আর হাসি ফুটিবে না, সে তারার হৃদয়ে আর জ্যোতি উছলিবে না, তথন সেই হাসি থাকিতে থাকিতে জ্যোতি চমকিতে চমকিতে কে জানে তাহারা মরিয়া যায় না কেন?

ভাবিতে ভাবিতে পূর্ণ স্নেহভরে মুন্নার মাথায় মহম্মদ হাত রাখিলেন,—মুন্না ঘুমাইয়াছে ভাবিয়া এতক্ষণ তাহাকে তিনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ

সে কথা ভুলিয়া গেলেন। হস্তস্পর্শে মুন্না চমকিঁয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া, কত যেন নিরাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তুমি মসীন!" তাহার পর আবার বালিসে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। যেন মুন্না আর কাহাকেও দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল—তাহাকে দেখিতে পাইল না।

মসীন তাহা বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তর প্রদেশে যে আশাকণা লুকাইয়া ছিল প্রচণ্ড বাতাসে তাহা যেন নিভিয়া গেল। তিনি দেখিলেন মুন্নার সম্মুখে বিষাদের অনন্ত রাত্রি, সমস্ত জীবনেও এ রাত্রি প্রভাত হইবার আশা নাই। তিনি বুঝিলেন তাঁহায় স্নেহ-বারি সমুদ্রের আকার হইলেও মুন্নার জ্বলন্ত হৃদয় শীতল করিতে পারিবে না, তাঁহার প্রাণ দিলেও তাহার দুঃখ ঘুচাইতে পারিবেন না—কষ্টের বিদ্যুৎশিখা তাঁহার হৃদয় দিয়া চলিয়া গেল।

এ কষ্টে অভিমান লুকান ছিল কি না জানিনা, যদি থাকে ত তাহা এত সামান্য যে তিনি তাহা নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে মুন্নার সুখশান্তি ফিরাইতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ—ইহা ছাড়া আর কোন কথা তাঁহার মনে নাই।

মানুষে যাহা পায় তাহা কেন চায় না? যাহা চায় তাহা কেন পায় না? সংসারের এ রহস্য কে বুঝাইবে?

মসীন যে মুন্নার চোখের জল মুছাইতে জীবন দিতে পারেন—কিন্তু সে স্নেহের অসীমতায় মুন্নার হৃদয় পূরিল না! আর যে হৃদয়ে মুন্নার জন্য স্নেহের বিন্দুমাত্র নাই—সেই হৃদয়ের এক বিন্দু স্নেহ পাইবার জন্য মুন্নার হৃদয় আকুল!

রজনী নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতে লাগিল, বাঁশ বনে শৃগাল গুলা উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া পড়িল, খাঁ জাহান খাঁর নহবৎ খানায় মুলতান রাগ বাজিয়া বাজিয়া স্তব্ধতার প্রাণে মিলাইয়া গেল, মসীন অনন্য হৃদয়ে মুন্নার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কি করিলে আবার সে আগের দিন ফিরিয়া আসে, মুন্নার ম্লানমুখে আবার হর্ষের হাসি ফুটিয়া উঠে?"

রজনী গভীর হইল, জানালা দিয়া যে তারা গুলি দেখা যাইতেছিল তাহারা সরিয়া পড়িল, গঙ্গার পরপারে বনানীর মধ্যে একটা কোকিল ঘুমঘোরে একবার কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মহম্মদ একই মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি করিলে মুন্না সুখী হইবে। ভাবিতে ভাবিতে কি জানি কি ভাবিয়া একবার অতি ধীরে ধীরে ডাকিলেন "মুন্না,"।

মহম্মদের সে আকুলকণ্ঠ স্নেহেরস্বর বুঝি বিষাদের স্তর ভেদ করিয়া মুন্নার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, মুন্না মুখ উঠাইয়া সচকিত-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল,

দেখিল তাহার বিবর্ণ ম্লান মুখখানি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তে একটা অনুতাপের ভাব তাহার হৃদয় দিয়া বহিয়া গেল, ভাবিল "ছি ছি কি করিয়াছি একবার ও মুখের দিকে ফিরিয়া চাহি নাই, মসীনের কষ্টের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম"।

মুন্না ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া বসিল—মহম্মদ কি বলিতে তাহাকে ডাকিয়াছিলেন আর বলা হইল না। মুন্না মহম্মদের দুই হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া আকুল-স্বরে বলিল—

"মসীন, ভাই আমার, আমার জন্য তুমি আর কত কষ্ট পাইবে? আমাকে ছাড়িয়া দাও—কোথাও চলিয়া যাই—আমি কাছে থাকিতে তোমার নিস্তার নাই—জানি না কি অদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়াছি, আমার স্পর্শে হাসিও অশ্রু হইয়া পড়ে।"

মহম্মদ চোখ মুছিয়া বলিলেন—"আমার কিসের কষ্ট মুন্না? আমিত সারাদিনই হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছি—তবে তোর কষ্টের মুখখানি দেখিলে যদি কখনো চোখে জল আসে, তাহাকে কি তুই কষ্ট বলিবি?"

কষ্ট কি না তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

মুন্না বলিল—"আমার জন্য কেন তোমার চোখে জল পড়িবে? আমি তোমার জন্য এমন কি করিয়াছি, যে তুমি আমার জন্য কাঁদিবে ভাই? আমি প্রাণ ঢালিয়া যাহাকে

ভাল বাসিয়াছি—সে যে আমার দুঃখে এক ফোঁটা জল ফেলে নাই--সে যে আমার পানে একবার না চাহিয়া চলিয়া গেল। আমিত আর কিছুই চাহি নাই—একবার দিনান্তে তাহার মুখখানি দেখিয়া আসিতাম আমার সে সুখটুকও তাহার প্রাণে সহিল না কি”—

মুন্না কি কথা বলিতে গিয়া কি কথা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মসীন উত্তেজিত স্বরে, “পাষাণ পাষাণ” বলিয়া উঠিয়া দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। মুন্না একটু পরে চুপ করিল, চোখের জল মুছিয়া প্রশান্তস্বরে বলিল, “না ভাই পাষাণ বলিও না, তিনি কি করিবেন? আমার এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে তাঁহার ভালাবাসা জন্মাইতে পারে। দোষ তাঁহার নহে, দোষ আমার। আমি যে দুর্লভ দ্রব্যের প্রত্যাশী হইয়া কাঁদিয়া বেড়াই, সে দোষ আর কারো নহে আমারই—”

মুন্নার কথাগুলিতে তাহার সরল হৃদয়ের এত খানি অকপট দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ পাইল যে মহম্মদ সে বিশ্বাসের বিপক্ষে কিছু বলিতে পারিলেন না,—তিনি বলিলেন— “দোষ কাহারো নহে—দোষ বিধাতার। এরূপ পবিত্র কোমল হৃদয়ে কষ্ট দিয়া তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তিনিই জানেন।”

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। মসীন বলিলেন “মুন্না, আমি পিতাকে আনিতে যাইব”।

এই কথাই তিনি প্রথমে বলিতে গিয়াছিলেন। মুন্না মহম্মদের মনের ভাব বুঝিতে পারিল, তাহার দুই চক্ষু আর একবার জলে পূরিয়া উঠিল—এমন স্নেহের, এরূপ আত্মবিসর্জ্জনের মর্য্যাদা মুন্না অনুভব করিতে পারিল না! এ ভালবাসায় মুন্না সুখী হইতে পারিল না! মুন্না কাতর হইয়া বলিল "ভাই পিতা কোথায়? তাঁহাকে কোথায় পাইবে? আমাদের কি আর কেহ আছে মসীন"।

ইহার ভিতর কতখানি নিরাশা কতদূর শূন্য ভাব? কিন্তু কে জানে কি করিয়া এই নিরাশার কথাগুলির ভিতর মহম্মদ যেন লুক্কায়িত আশার স্বর শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মনে হইল পিতাকে ফিরাইতে পারিলে মুন্নার যেন সুখ-শান্তি ফিরাইতে পারিবেন, মহম্মদের হৃদয় যেন সতেজ হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—

"মুন্না পিতা যেখানেই থাকুন, আমি তাঁহাকে লইয়া আসিব।"

মুন্না ইহা হইতে আর কি চায়? ইহা হইতে আর কোন আশা আর সে করে না—পিতার অনন্ত স্নেহের কোলে একবার আশ্রয় পাইলে দুঃখজ্বালা ভুলিয়া কতদিন কতদিন পরে—শান্তির ঘুমে একবার ঘুমাইতে পারে; কিন্তু পিতা আসিবেন কি? আর আসিলেও—আবার এই সংসারের মোহপঙ্কে পা দিয়া তাঁহার যদি শান্তিভঙ্গ হয়? আর মহম্মদ—তাহার স্নেহময় করুণাময় ভ্রাতা—তাহার

জন্য কত না সহিয়াছেন,—আবার তাঁহাকে নিজের সুখ অন্বেষণে—পথে বিপথে—দূর দূরান্তরে কষ্ট ভোগ করিতে পাঠাইবে"—মুন্না—মহম্মদের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"না ভাই আমি তোমাকে যাইতে দিতে পারিব না—"

মহম্মদ কথা শেষ করিতে দিলেন না—বলিলেন "মুন্না তাহা হইলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে, আমাকে বাধা দিস নে—আমার সুখের আশা ভাঙ্গিস নে মুন্না"।

মসীন স্থিরপ্রতিজ্ঞ উৎসাহ-পুর্ণ, মসীন মুন্নার হৃদয়ে আশার বিদ্যুৎ জ্বলিতে দেখিয়াছেন,সে আলো পথ দেখাইয়া তাঁহাকে কোথায় না লইয়া যাইতে পারে। মুন্না তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখে আহ্লাদের চিহ্ন দেখিতে পাইল, আশার বিকাশ দেখিতে পাইল, সে আশা তাহার কাছে মরীচিকা বলিয়া মনে হইল। পিতা যে আবার ফিরিয়া আসিবেন—এই আঁধার গৃহ কোন দিন যে একটুও আলো হইবে—তাহা সে কোন মতেই মনে করিতে পারিল না—অথচ মহম্মদের সে আশার ঘোর ভাঙ্গাইতেও তাহার ইচ্ছা হইল না। কি করিবে কি বলিবে যেন সে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

মুন্নার কাছে থাকিতে মহম্মদের সুখের আশা নাই তাহা ত মুন্না জানে, এ শ্মশানাগ্নির কাছে যে পড়িবে সেই যে শুকাইয়া যাইবে, এ অগ্নি আদর করিয়া যে ধরিবে

সেই যে পুড়িয়া যাইবে ইহা ত মুন্না অনেক দিন বুঝিয়াছে, তবে কেন মহম্মদকে এইখানে ধরিয়া রাখিতে চাহে! দূর দূরান্তরে বনে গহনে যেখানেই মহম্মদ যাননা কেন সে কষ্ট কি এ কষ্টের তুলনায় সামান্য নহে? যে দিন এই অগ্নিময় মরুভূমি ছাড়াইয়া মহম্মদ প্রকৃতির শীতল শ্যামল সৌন্দর্য্য রাজ্যে পদার্পণ করিবেন সেদিন মহম্মদের নবীন হৃদয় প্রভাতের পাখীর মত যে গাহিয়া উঠিবে, নির্ম্মল আনন্দে তাহার হৃদয় যে স্ফূর্ত্তিময় হইয়া উঠিবে—তবে কেন মুন্না তাহাকে যাইতে বাধা দিবে? মুন্না যেন মহম্মদের সেই হাসিময়, স্ফূর্ত্তিময়, আনন্দময়-মুখ-চ্ছবি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মুন্নার দুঃখের প্রাণেও সুখের বিদ্যুৎ হাসিয়া উঠিল, মুন্নার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল, মুন্না মনে মনে বলিল "তবে তাহাই হউক—" চোখের জলের অব্যক্ত-ভাষায় মহম্মদকে কহিল "তবে তাহাই হউক"। রজনী আরো গভীর হইল, আশাপূর্ণ হৃদয়ে মহম্মদ চলিয়া গেলেন, মুন্না একাকী সেই নির্জ্জন ঘরে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ প্রকৃতিকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল 'তবে তাহাই হউক,' করযোড়ে উদ্ধদৃষ্টি হইয়া সজলনেত্রে বারবার করিয়া কহিল "তবে তাহাই হউক—ভগবান, একবার মাত্র এ দুঃখিনীর প্রার্থনা সফল কর,—তাহার নবীন প্রাণে আবার হাসি ফুটিয়া উঠুক।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

খাঁ জাহান খাঁ।

লোকের নাম অনেক রকমে অমর হইয়া থাকে, আক্‌বর সাহের নামও অমর, আর সিরাজউদ্দৌলার নামও অমর, ওয়ারেন হেষ্টিংসকেও ভারতবাসী ভুলে নাই, আর লর্ড রিপণকেও ভুলিবে না,—আর আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন হুগলি সহরে পাশাপাশি যে দুইটি লোক বিচরণ করিয়াছিলেন—একটি লোক আড়ম্বরবিহীন ফকীরচেতা মহম্মদ মসীন, আর একটি লোক রাজক্ষমতাশালী নবাব খাঁ জাহান খাঁ, ইহাদের দুজনের নামই এখন পর্য্যন্ত হুগলীর লোকের মনে জাগিয়া আছে। তবে এ মনে থাকার মধ্যে তফাৎ এইটুকু, একজনের স্মৃতি যেন বসন্তের সুরভি-কুসুম, তাহার কথা মনে করিলেই হৃদয়ে একটি সুখের ছবি জাগিয়া উঠে, আর একজন যেন সে ফুলের পাশে একটি কাঁটা।

কেবল হুগলি বলিয়া নহে, বাঙ্গলার অনেক স্থানে এখনো নবাবের নামের উল্লেখ শুনা যায়—বুড়াবুড়ীদের নিকট খাঁ জাহান খাঁর নামটাত অলঙ্কার শাস্ত্রের একটা তুলনাবিশেষ, সুযোগ পাইলেই তাঁহারা এই তুলনাজ্ঞানটাকে রীতিমত খাটাইতে ছাড়েন না। যদি কোন ছেলে এসেন্সটুকু মাখিয়া সাফ্‌ ফুরফুরে ধুতী চাদর যোড়াটি

পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—অমনি বৃদ্ধা দিদিমা ঠাকুরমারা বলিয়া উঠিলেন—"এস এস আমাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ এস" কেহ যদি বুক ফুলাইয়া একটা কথা কহিল, জোরে দুবার মাটিতে পা ফেলিল অমনি বুড়হাড়া লোকেরা বলিয়া উঠিলেন—"বেটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ। বিলাসিতা, ক্ষমতা, অত্যাচারের সহিত নবাব জাহান খাঁর নামটি এখনো মিশ্রিত। নবাব অনেকদিন পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার প্রাণহীন একটা বিকৃত-ক্ষীণ ছায়া এখনো এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কবে সে ছায়া একেবারে মিলাইয়া পড়িবে কেজানে।

খাঁ জাহান খাঁ নবাবী-আমলের ফৌজদার। সম্প্রতি বৎসর খানেক হইতে চলিল যদিও ইংরাজ বাঙ্গলা জয় করিয়াছে কিন্তু তাঁহার ইহাতে কোনই ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার পদ সমানই রহিয়াছে—তাঁহার ক্ষমতা আগেকার অপেক্ষা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ইংরাজদিগের বর্ত্তমান রাজনীতির কড়াক্কড় শাসন প্রণালীর মধ্যেও মফঃস্বলের জজ মাজিষ্ট্রেটদিগের যেরূপ প্রভাব যেরূপ যথেচ্ছাচার দেখা যায়—তাহা হইতেই বুঝা যাইতে পারে—নবাবের তখন কিরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। বাঙ্গলা তখন একরূপ অরাজক, ইংরাজ মিরজাফরকে পুতুল রূপে সিংহাসনে বসাইয়া বাঙ্গলার প্রকৃত কর্ত্তা হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এক পক্ষে ইংরাজ, অন্য পক্ষে নবাব আপনাপন স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত,

এ সময় রাজ্যের ভাল মন্দের প্রতি কে দৃকপাত করে? শাসনের রীতিমত নূতন বন্দোবস্ত ত কিছুই হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ মুসলমান আমলে যাহা কিছু শাসন শৃঙ্খলা ছিল—এই নূতন বিপ্লবে তাহাও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, খাঁ জাহান খাঁর মাথার উপরে 'উপরি-ওয়ালা' একটা কেহ নাই বলিলেই হয়। সুতরাং এ সময় তাঁহাকে হুগলির সর্ব্বেসর্ব্বা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর ভয়ে যেন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লোকের এভয়ের উৎপত্তি তাঁহা হইতে ততটা নহে, যতটা তাঁহার কর্ম্মচারীগণ হইতে,তাঁহার শাসনে ততটা নহে, যতটা অশাসনে। অন্য কি কথা, নবাবের উপরও তাহারা একরূপ নবাব। নবাব যদি কাহাকেও দুই টাকা দান করিতে হুকুম দেন তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যগণ তাহাকে এক টাকা দেয়—আর একটাকা—নিঃস্বার্থতার আতিশয্যে নিজেদের পকেট-জাত করে। তাহারা ভাবে ইহাতেই নবাবের অধিকতর পুণ্য সঞ্চয় হইবে। তবে অন্যেদের প্রতি যে দান তাহারা প্রশস্ত ভাবে—তাহা দিতে কখনো কুণ্ঠিত নহে। নবাব যদি কাহাকে এক জুতা মারিতে হুকুম দেন—ত তাহারা তাহাকে দশ জুতা অবিলম্বে বিনা চিন্তায় দান করিয়া ফেলে। এইরূপে নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া—আপনাদের অকল্যাণের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য

না করিয়া যেন তেন প্রকারে তাহারা নবাবের স্বর্গরাজ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখে। ইহাদের হাতে বেচারা গরীব লোকদের কিরূপ সহ্য করিতে হয় তাহা নিম্নের ঘটনাটি হইতে প্রকাশ পাইবে।

এখন হুগলির যেখানে দেওয়ানি আদালত, মহাফেজ-খানা—ও ব্রাঞ্চ স্কুল তখন ঐখানে খাঁজাহান খাঁর সদর অন্দর প্রকাণ্ড দুইটি বাটী। বাটীর সম্মুখেই উদ্যান, উদ্যানের সীমানায় রাস্তার ধারে সমুখাসমুখি দুইটি দোতলা নহবৎ খানা। এক দল প্রহরী বাটীর দ্বারে, আর একদল প্রহরী এই নহবৎখানার সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত। প্রহরীদের জালায় এই রাস্তা দিয়া গরীব দুঃখীরা পারতপক্ষে কেহ যাতায়াত করিতে চাহে না, কেবল যাহাদের সঙ্গে তাহাদের মাসিক বন্দ'বস্ত আছে তাহারাই মাত্র নির্ভয়ে সেথান দিয়া যাইতে পারে।

আজ নহবৎখানার নীচেতলার ঘরের মধ্যে এক গরীব বেচারা চুড়িওয়ালা আসিয়া বসিয়া আছে, তাহার আশে পাশে সমুখে পিছনে পিঁপড়ার রাশের মত প্রহরীরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুড়িওয়ালার যেমন গ্রহ সে ঐ রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল,—সে বুঝি শহরে নূতন বসতি করিতে আসিয়াছে—এখানকার ব্যাপার অত শত এখনো জানিতে পারে নাই। তাহাকে দেখিয়াই পূর্ব্ব রাত্রের চুড়ির ফরমাসের কথা প্রধান প্রহরীর আগে মনে পড়িয়া গিয়াছে,

তাহার পর ক্রমে মিরু, মিয়া, আলি, বাকের, সাকের প্রভৃতি যত রাজ্যের প্রহরীদের জন্মান্তরের স্মৃতি পর্য্যন্ত মনে উদিত হইয়াছে; কোন্ দিন কাহার কোন ভাগিনির ননদের একযোড়া চুড়ির জন্য সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই, কোন দিন কাহার প্রেয়সী তাহার ভাইঝি জামাইএর মামাত বোনের জন্য জরিবসান চুড়ি না পাইয়া সারাদিন মান করিয়া বসিয়াছিলেন—কোন দিন বা কাহার পুত্রবধূর ঠাকুরমার হাতভরা কাঁসার চুড়ি ছিল না বলিয়া গৃহিণী লজ্জায় নিমন্ত্রণে যাইতে পারেন নাই—সকলি মনে পড়িয়া গিয়া চুড়িটা তখন সকলের জীবনের পক্ষে এতটা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে—যে যেন জল না খাইয়া একমাস থাকা যায়—কিন্তু চুড়ি নহিলে আর একদিন চলে না। এই প্রয়োজনীয় জিনিসটা বিহনে এতদিন যে কি করিয়া তাহারা বাঁচিয়াছিল তাই ভাবিয়াই তাহারা অবাক হইয়া গেছে—বোধ করি, বাঁচিয়া—আছে কি না, সে বিষয়েও কাহারো কাহারো দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

যাই হোক, চুড়িওয়ালাকে ডাকিয়া ঘরে বসান হইলে প্রধান প্রহরী একযোড়া বেলোয়ারি চুড়ি উঠাইয়া লইয়া দাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে বলিতেছে—

"চার আনা, মশায়, বড় শস্তা, আপনার সঙ্গে আর দরদাম করিব না, এক রকম অমনিই দিয়া যাইতেছি,"

চুড়িওয়ালাও ইতি মধ্যে বাতাসে প্রাসাদ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, সে ভাবিতেছে এতগুলা লোক চুড়ি লইলে সেত এক দিনে সদ্য সদ্য বড়মানুষ হইয়া যাইবে, কেবল একালে প্রাসাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা একটা করিয়া পাওয়া যায় না, এই যা তাহার দুঃখ! হঠাৎ তাহার বাতাসের বাড়ীটা নিমেষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রহরী মির-আলি পাশেই একগাছা মোটা লাঠির উপর দুই হাতের ভর দিয়া বাঘের মত দৃষ্টিতে তাহার উপর চাহিয়াছিল—কামড়ের যেন একবার অবসরটা পাইলেই হয়। মিথ্যার উপর তাঁহার প্রকাণ্ড ঘৃণা, নবাব বাটীর সীমানার বাহিরের লোকে কথা কহিলেই তাহা মিথ্যা বলিয়া তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠেন, কেন না তাঁহার দলভুক্ত লোকেরা বিশেষতঃ মির-আলি নিজে কখনও খাঁটি সত্য বই কিছু কহিতে জানেন না। তবে লোকে বলে বটে, মির আলিকে কেহ এ পর্য্যন্ত ভুলিয়া কোন সত্য কথা কহিতে শোনে নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, জগৎশুদ্ধ লোক যে মিথ্যাবাদী (মির আলি ছাড়া) ইহাতে ত বরং আরো তাহাই প্রমাণ করে।

চুড়িওয়ালার কথায় তিনি চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বদমাস্‌, ঝুটা-বোলনে-ওয়ালা! জান্‌হিস না দো-পয়সায় ঠিক হামি এয়স্যা চুড়ি আবি মূলিয়ে লিয়েছে।"

হঠাৎ আবার এই সঙ্গে প্রহরী মিরুমিয়ার পরোপকার

প্রবৃত্তিটাও তেজাল হইয়া উঠিল, এ প্রবৃত্তিটা প্রহরীর কোন জন্মে প্রবল ছিল কি না বলিতে পারি না, এজন্মে কিন্তু তাহার অঙ্কুরেও আভাস পাওয়া যায় নাই। তবে সময়ের গুণে সবই করে, যা নয় তাই হইয়া উঠে, যে আজন্ম কাল কখনো ভাবের ধার ধারে নাই বসন্তকালে কোকিল ডাকিয়া উঠিলে তার হাত দিয়াও হঠাৎ দুলাইন কবিতা বাহির হইয়া পড়ে, প্রহরী বেচারারই বা তবে অপরাধ কি? সেও নিঃস্বার্থ চিন্তায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল "এমন কর্‌কে আদমি লোককো ঠকাতা তু বাঁদিকা বাচ্ছা, কুত্তা, তেরা জান আজ হামার হাতমে।"

এতক্ষণ প্রধান প্রহরী চুপ করিয়াছিলেন—কিন্তু আর পারিলেন না, ইঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তিটা আবার সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। প্রহরীদের মধ্যে গাজি অর্থাৎ ধার্ম্মিক বলিয়া ইঁহার একটা নামই ছিল, ইনি আপনাকে ইমাম হোসেনের বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেন, রোজ পাঁচ বার নেমাজ পড়িতেন ও কাফের দেখিলেই রক্তপান করিবার জন্য লালায়িত হইতেন। প্রধান প্রহরী কেবল চুড়িওয়ালাকে গালি দিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার মোটা-মোটা লৌহ গাঁটওয়ালা আঙ্গুলগুলা একত্র করিয়া বিষম জোরে তাহাকে এক চড় বসাইয়া দিয়া কহিল "হামলোক-কো ঠকানে এসেছিস তু কুত্তা, বিল্লি, বান্দর, গাধ্ধা।"

চুড়িওয়ালার পা হইতে মাথাশুদ্ধ ঝনঝন করিয়া উঠিল, সে সামলাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল "ধর্ম্মাবতার দোহাই বলছি দু আনা আমার খরচা পড়েছে"—

চুড়িওয়ালাকে মারিয়া আপনার বীরত্বে স্ফীত হইয়া প্রধান প্রহরী মহা দম্ভে বড় বড় দুই জোড়া গোঁপে তা দিতেছিলেন, চুড়িওয়ালার কথায় বলিলেন "ফের ঐ বাত উল্লুক।"

চুড়িওয়ালা সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সে ভাবিল এতগুলা লোক রহিয়াছে কেহ কি তাহাকে একটু দয়া করিবে না? কিন্তু একটা করুণ-দৃষ্টির পরিবর্ত্তে চারিদিক হইতে বড় বড় লাল পাগড়িওয়ালা—রাক্ষসের মত কঠোর মায়া দয়া হীন মুখ গুলার মাঝখান হইতে লাল লাল ঘূর্ণমাণ চোখের রাশি যখন তাহার চোখের উপর পড়িল সে আঁতকিয়া উঠিল—তাহার মনে হইল সে যমপুরীর ভিতর অবস্থান করিতেছে। দুপয়সা চুলায় যাক, বিনা-পয়সায় চুড়ি দিয়া প্রাণটা লইয়া তখন সে পলাইতে পারিলে মাত্র বাঁচে। দামের জন্য পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা না করিয়া— 'হুজুর যা বলেন' বলিয়া চুপড়ি মাথায় লইয়া সে উঠিতে উদ্যত হইল। একজন প্রহরী তার হাত হইতে ঝুড়িটা টানিয়া লইয়া বলিল "বেআদপ, এয়স্যা কাম তোম্‌হার, আলবৎ আজ তোর শির লেবে"

চুড়িওয়ালা কাঁদিয়া বলিল "কিছুই ত করিনি, বাবা,

আমায় ছেড়ে দাও বাবা, হুজুর ধর্ম্মাবতার, যোড় হাতে বলছি ছেড়ে দাও বাবা।”

প্রহরী মুখ ভেংচাইয়া বলিল “বাবা, বাবা, তোর বাবা কোন হ্যায় রে ইল্লৎ,ফের ও বাং বলবি ত মুখ তোড় ডাল্‌ব। সেলাম না কর্ উঠা সেটা ইরাদ আছে, কি নেই ?”

তখন বাকের আলি বলিল “হাঁ এয়স্যা বেআদপী ! সেলাম নেই করেছে ? চল নবাবশাকা পাশ।”

চুড়িওয়ালা নবাব শাকে কোন জন্মে দেখে নাই, তিনি মানুষ কি জন্তু-বিশেষ মানুষ পাইলেই উদরসাৎ করেন, ইতি পূর্ব্বে তাহার সে জ্ঞান কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন তাঁহাকে তাহা হইতেও ভয়ানক মনে হইল। ভৃত্যদিগকে দেখিয়া যেরূপ নমুনা পাইয়াছে তাহাতে প্রভুকে রক্ত-পিপাসু, লোলজিহ্ব, নরমুণ্ডধারী, দৃষ্টি মাত্রে শত মনুষ্য ভস্মকারী, ভীষণমূর্ত্তি দেবতার মত মনে হইতে লাগিল। চুড়িওয়ালার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সে বলিল “দোহাই তোমাদের, আমার যাহা আছে সব সেলামী দিয়া যাই তেছি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।” চুড়িওয়ালা ভাবিল সেলাম আর সেলামী একই কথা ইহার জন্যই এতটা উৎপাৎ চলিতেছে।—এ অনুমানটা একেবারে বেঠিক হয় নাই, অল্পক্ষণের মধ্যে প্রহরীরা চুড়িগুলি প্রায় সমস্তই আজাড় করিয়া ঝুড়িটা পা দিয়া চুড়িওয়ালার দিকে ঠেলিয়া বলিল “তোর চিজ্ কোন লেবে, এই লিয়ে যা।”

ঝুড়ি লইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে অৰ্দ্ধ ক্রোশ দূরে আসিয়া তখন চুড়িওয়ালা হাঁপ ছাড়িল,—চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া তখন আস্তে আস্তে একটী গাছের তলায় বসিয়া, ঝুড়ির ঢাকাটি খুলিল, যখন দেখিল—তাহার যথা-সম্পত্তি সৰ্ব্বস্বই প্রায় অপহৃত হইয়াছে—সে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ঐখান দিয়া মহম্মদ মসীন কোথায় যাইতেছিলেন তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল শুনিয়া তখনি তাহাকে সেই চুড়ির মূল্য দিলেন—এবং অনেক বলিয়া কহিয়া নবাবের নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে সম্মত করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। নবাবের কাছে দরখাস্ত পাঠান হইল, কিন্তু বিচারে প্রহরীদের দোষ কিছুই প্রমাণ হইল না। বিচারের পর দ্বিগুণ বুক ফুলাইয়া তাহারা নিজ নিজ স্থানে আসিয়া বসিল।

এইরূপ বিচারের নামে কত অবিচার, ক্ষমতার পদতলে কত অক্ষম প্রতিদিন দলিত হইতেছে, জানি না কবে পৃথিবী ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যেদিকে চাই চারিদিকেই প্রজ্জ্বলিত মরুময়ী নিরাশা,—অনন্তের সীমানা পারে আশা লুকাইয়া পড়িতেছে,—এক একবার যাহাকে আশা মনে করিতেছি—তাহা মরীচিকা মাত্র।

বিচারের দিন রাত্রে চুড়িওয়ালার খড়ের বাড়ীটি পুড়িয়া ভস্ম হইল—সে পরদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহম্মদের নিকট

আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার উপরেই তার যত রাগ, তিনিই ত দরখাস্ত করিয়া এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন, সেত কোন মতে তাহাতে রাজি ছিল না, সেত জানিয়াছিল তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে।

মহম্মদ তাহাকে নূতন ঘর বাঁধিবার টাকা দিলেন—সে অন্য গ্রামে উঠিয়া গেল! মহম্মদ ভাবিলেন এই অত্যাচারের কথাটা একবার নিজে খাঁ জাহানকে বলিবেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রধান প্রহরী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে তাহার দু-এক দিন পরে ভোলানাথ নবাব বাটীর পশ্চাতের রাস্তা দিয়া চলিতেছিলেন। এ রাস্তায় নবাবী আড়ম্বর কিছুই নাই—প্রহরীদিগের শিরস্ত্রাণের লাল রংটুকু ব্যস্ত এখান দিয়া দেখা যায় না—নবাবীয়ানার মধ্যে যা নবাববাটীর পশ্চিম দিগের প্রকাণ্ড প্রাণহীন দেয়ালটা সগর্ব্বে উচ্চে মাথা তুলিয়া আছে! এ রাস্তা দিয়া লোকজন বড় চলে না, কেবল জন-দুই গরীব-দুঃখী মাত্র ভোলানাথের কাছ দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহারা দুইজনই পশ্চিমদিকে চাহিয়া দশ বিশবার সেলাম করিয়া গেল। ভোলানাথ

ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেদিকে এক লোকের মধ্যে যা তিনি—কিন্তু তিনি কি এত বড় লোকটা যে তাঁহাকে পথের অপরিচিত লোকে পর্য্যন্ত সেলাম করিয়া যাইবে। তাঁহার মনে বড়ই অশোয়াস্তি উপস্থিত হইল। এই সময় আবার একটা তরকারী-ওয়ালা ঝাঁকা মাথায় করিয়া ঐ দিকে চাহিয়া সেলাম করিল,—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেলাম কর কাকে জি—এখানে ত কেহই নাই।" তিনি আপনাকে একটা কেহর মধ্যেই বুঝি গণ্য করিতেন না। ঝাঁকাওয়ালা দাঁড়াইয়া দেয়ালটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। ভোলানাথ যদিও ইহাতে বিশেষ কিছুই জ্ঞান-লাভ করিলেন না—তবে এইটুক বুঝিলেন যে, সেলামের লক্ষ্য তিনি নহেন—ঐ দেয়ালটা। তাহা বুঝিয়া তাঁহার প্রাণ হইতে একটা ভার কমিয়া গেল বটে—কিন্তু আশ্চর্য্যের ভাব কিছু মাত্র কমিল না। তিনি হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভোলানাথ জন্মে আর কখনো এরূপ অবাককারখানা দেখেন নাই, তিনি এক জন মুসলমানকে জানিতেন বটে, সে যদিও প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ পড়িত, অথচ হিন্দুর দেবদেবী দেখিলেই প্রণাম করিত, বৈষ্ণবদের সহিত হরি সঙ্কীর্ত্তন গাহিত, বৌদ্ধদের সহিত বুদ্ধদেবকে ভজনা করিত, ইত্যাদি,—কিন্তু এমন কাজ সে কখনো করে নাই,

ঘরবাড়ী প্রভৃতি ভোলানাথ যাহা জড় বলিয়া জানেন তাহাদের কাছে সে কখনও মাথা নোয়ায় নাই। তবু তাহাই তখন ভোলানাথের কাছে এমনি রহস্যকর মনে হইয়াছিল যে তিনি এক দিন সেই মুসলমানকে পাকড়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বাপু হে এ কিরূপ?" সে বলিয়াছিল—"মশায় কোন দেবতা সত্যি তা কে জানে, তবে যেটা সত্যি হোক সবাইকেই সন্তুষ্ট করা ভাল—আমাকে তাহলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।" সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্মগ্রহণের তাৎপর্য্য সেই অবধি তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু আজকের কারখানাটা সে তাৎপর্য্য দিয় তলাইতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন "কিন্তু দেয়ালকে সেলাম করিতেছ—ওটা যে জড় পদার্থ।" সে বলিল—"ও মশায়—আপনাদের ঠাকরুণ ত খড়ের গ্যাদায় বসো সব দেখে, আর দেয়ালটার ভিতর দিয়ে কি কেউ দেখতে পায় না।"

কথাগুলো ঠিক ভোলানাথের মাথায় গিয়া পৌঁছিল না,—তিনি হাত রগড়াইতে সুরু করিয়া বলিলেন—"কি বল্লে জি, দেয়ালের ভিতরেও কি তোমাদের পীরের অধিষ্ঠান নাকি"—সে বলিল, "হ্যাঁ পীরই বই কি। না সেলাম করলে কি আমাদের মাথা থাকে? আপনি কি মশায় এদেশের লোক নও নাকি! সেলাম না করে চুড়িওয়ালার কি হয়েছে জান না মশায়? সেই অবধি নবাবের হুকুম

হয়েছে—ঘরের কাছ দিয়ে যে মাথা নুইয়ে না যাবে—তার মাথা দিয়ে গঙ্গার পুল তৈরি হবে।”

ভোলানাথ শুনিয়া মহা চিন্তিত হইলেন, “তাইত তাইত” করিতে করিতে ঘুরিয়া একেবারে সদর দ্বারে আসিয়া প্রধান প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ দরোয়ানজি একটি কথা বলিতে আসিয়াছি। একবার নবাবশার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হচ্ছে।”

প্রহরী বলিল—“ক্যা বোলতা তোম, এ কাঁহাসে আ-য়ারে উল্লু ?”

ভোলানাথ হাসিয়া বলিলেন—না রে না উল্লুক নই—আমি মহম্মদ মসীন সাহেবের গাইয়ে ভোলানাথ।” ভোলানাথ ভাবিলেন পরিচয় পাইয়া নবাবের কাছে লইয়া যাইতে প্রহরীগণ তিল-বিলম্ব করিবে না।

প্রহরী বলিল—“কোন তেরা মহম্মদ মসীন ? ওতো নবাবশাকা পাঁউকা জূতী আছে।”

ভোলানাথ রাম রাম করিয়া উঠিলেন—তাঁহার বড় রাগ হইল, তিনি বলিলেন—“দরোয়ান জি, তোমাদের বড় বৃথা অহঙ্কার হয়েছে—আমার মনিব তোমার মনিবের চেয়ে একশ গুণে হাজার গুণে লক্ষ গুণে বড় ?”

প্রহরী অনেক লোক দেখিয়াছে—এমন গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা নাছড়বান্দা-লোক আর দুটি দেখে নাই, ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া দূর করিয়া দেয়, কিন্তু বিকাল হইয়াছে.

নবাব সা এখনি উদ্যানে বেড়াইতে আসিতে পারেন, তাই কষ্টে ইচ্ছাটা দমন করিয়া বলিল—"ক্যা বক্‌বক্ করতা, যাওগি কি নেই ?"

ভোলানাথ বলিলেন—"রাগ করিওনা জি, তোমার মনিবের মানের ভাণ্ডার এমনি খালি—যে পথের লোকের সেলাম চাহিয়া সে ভাণ্ডার পূরাইতে হয়। আর আমার প্রভু, আপনার মানে এত পূর্ণ যে অন্যের কাছ হইতে এক ফোঁটা মান তিনি চাহেন না, বরং জগতের গরীব দুঃখী-দিগকে পর্য্যন্ত মান দান করিয়া তিনি ফুরাইতে পারেন না। এখন বল দেখি কার প্রভু বড় হইল।"

প্রহরীর অতদূর বাঙ্গলা বিদ্যা ছিল না, যে ভোলানাথের কথার মর্ম্মটা তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, সে ভাবিল, ভোলানাথ কি রকম মস্ত গালাগালিটাই না জানি তাহাকে দিয়া লইলেন—তাহার আর সহ্য হইল না, বজ্র আঁটুনিতে সে বাম হাত দিয়া ভোলানাথের ঘাড় চাপিয়া ধরিল, ভোলানাথও নিতান্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, মাথাটি তাহার নীচু হইয়া পড়িয়াছে—তিনি সেই অবস্থায় চকিতের মত একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া তাহার বুক জড়াইয়া ধরিলেন। সেও তখন ঘাড়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিল। দুজনে জড়াজড়ি করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন—অন্য প্রহরীগণ হাঁ হাঁ করিয়া চারিদিক হইতে আসিয়া পড়িল, বৃদ্ধ ভোলানাথের হাড়

গুলা পিশিয়া ময়দা করিয়া ফেলিতে চারিদিক হইতে রাশি রাশি হস্ত উত্তোলিত হইল—এই সময়ে উদ্যানে নবাব শা আসিয়া দাঁড়াইলেন—প্রহরীগণ ভয়-কম্পিত কণ্ঠে একবার "নবাব শা নবাব শা—বলিয়া বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। প্রহরী নবাবের নাম শুনিয়া ভোলানাথকে ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি মাটি হইতে উঠিল—দেখিল নবাবশার ভীম-ভ্রূকুটি বদ্ধ নেত্রযুগল দিয়া অনল বহির্গত হইতেছে—ভয়ে সে কাঁপিয়া উঠিল। ভোলানাথ হাঁপাইয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উদ্যানে নবাবশাকে দেখিয়া তাঁহার বড়ই সুযোগ মনে হইল—তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আমি একটি কথা বলিতে আসিয়াছি, গরীবদের প্রতি অন্যায় করিবেন না—ঈশ্বর আপনাকে উহাদের রক্ষা করিতে দিয়াছেন—বধ করিতে দেন নাই" —

ভোলানাথের কথা শেষ হইতে না হইতে নবাবশা দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রাসাদে চলিয়া গেলেন। ভোলানাথ অত্যন্ত নিরাশ হইয়া ঘরে গিয়া তানপুরাটীকে লইয়া গান ধরিলেন—

মা ব'লে আর ডাকব না মা
নাম রেখেছি পাষাণ-মেয়ে,
ডাকছি এত আকুল প্রাণে
দেখ্‌লিনে তবুও চেয়ে।

সবাই বেড়ায় হাহা করে
সবার চোখে অশ্রু ঝরে
অশ্রু নয় সে হৃদয় ফেটে
রক্ত রাশি পড়ে বয়ে !
কেমন মায়ের ভালবাসা !
সে রক্তে তোর মিটে তৃষা !
মা হয়ে মা নৃত্য করিস
সন্তানের রক্ত পিয়ে !
কি গুণে সবে না জান
তোয় করুণা রাণী !
এমনত পাষাণী আমি
দেখি নাই ভূমণ্ডলে।
মা আমার জননি ওমা
মা বলে আর ডাকিব না
সন্তানে স্নেহ দিলিনে—
ছি ছি মা জননী হয়ে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

খাঁজাহান খাঁর ঘাড়ে কাজ কর্ম্মের ভার—অনেক, কিন্তু আসলে ইহার ধার তিনি বড় কমই ধারেন। সুন্দরী বেগমগণের বিম্বাধরের হাসি লইয়া, মদির আঁখির কটাক্ষ লইয়া অভিমানের অশ্রু [illegible] লইয়াই তাঁহার কারবার। এক কথায়, খাঁজাহান খাঁ [illegible] বিলাসী। [illegible]সের প্রমোদ-বনে প্রেমের ফুলশয্যার তাঁ[illegible] স্বপ্নহীন একঘুমে কাটাইতে পারিলে তিনি [illegible] কিছু চাহেন না। কিন্তু কি জানি কেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, তিনি যে বিরাম পাইতে চাহেন কিছুতেই যেন তাহা পান না।

বুঝি কিছুতেই তাহা পাইবেন না, যেখানে তৃপ্তি নাই যেখানে বিরাম নাই সেখানেই যে তিনি তাহা অন্বেষণ করিতেছেন। খাঁজাহান খাঁ লালসাকে প্রেম বলিয়া মনে করিতেছেন, মোহকে নিদ্রা বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। খাঁজাহান জানেন না ও তৃষ্ণায় তাঁহার সুখ নাই ও নিদ্রায় তাঁহার শান্তি নাই, জীবনের রক্ত দিয়া যে আকাঙ্খাকে পুষ্ট করিতেছেন হৃদয়ের শেষ রক্ত বিন্দু যখন সে শুষিয়া লইবে তখনও সে আকাঙ্খার তৃপ্তি নাই। আকাঙ্খার বলিদানেই মাত্র এ আকাঙ্খার একমাত্র

পরিতৃপ্তি—এ তৃষ্ণার একমাত্র নিবৃত্তি,—তাহা জাহানখাঁ জানেন না।

এ অবস্থায় কাছারীর কাজ কর্ম্মে খাঁজাহানের কিরূপ মনোযোগ তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। না বসিলে নয়—তাই প্রত্যহ নিয়মিত একবার করিয়া কাছারি ঘরে আসিয়া বসেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক কাজ না শেষ হইতে হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যান্। কর্ম্মচারীগণই একরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা। এক একবার কেবল কোন বিশেষ কারণ ঘটিলে তাঁহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন চারিদিকে হুলস্থূল বাধিয়া যায়—কর্ম্মচারীগণ ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়ে। তবে রক্ষা এই—নবাব যতটা গর্জ্জেন ততটা বর্ষেণ না।

কাল বিকালে আর কি তাহাই হইয়াছে,—প্রহরীদের অত্যাচার দেখিয়া খাঁজাহান এতটা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন—যে এককালে সমস্ত বাগানের প্রহরীদের জবাব দিতে হুকুম হইয়া গিয়াছে। একে ত প্রহরীদের নামে ক্রমাগত কয়দিন ধরিয়া অভিযোগের উপর অভিযোগ আসিতেছে, মহম্মদ মসীন নিজে পর্য্যন্ত আসিয়া সকালে প্রহরীদের অত্যাচারের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আবার আজ কাছারীর সময় অভিযোগ পত্র-রাশির জ্বালায় তাঁহার অন্তঃপুর যাইবার সময় পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—এই বিরক্তি ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে আবার ঐ ঘটনা চোখে

পড়িয়াছে—কাজেই আগুণে ঘৃত পড়িল, নহিলে অন্য সময় হইলে, খাঁজাহান খাঁ এ ঘটনায় এতদূর জাগিয়া উঠিতেন কিনা তাহা বলা যায় না।

* * * * *

পর দিন নিয়মিত সময়ে কাছারি বসিয়াছে। নবাব খাঁজাহান খাঁ একটি কিংখাপ জড়িত মুক্তাঝালরশোভিত উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, ডাইনে বামে ও পশ্চাতে আসা-সোটা ধারী, সুসজ্জিত ভৃত্যগণ দাঁড়াইয়া আছে। ভৃত্য-দিগের পরিচ্ছদ হইতে, নবাবের পরিচ্ছদ হইতে, গৃহের ফুলময় সজ্জার মধ্য হইতে, আতর গোলাপ ও নানাফুলের গন্ধ উঠিয়া ঘরটি ভুরভুর করিতেছে। নীচে ফরাস বিছানার উপর কর্ম্মচারীগণ বসিয়াছে। ফৌজদার জাহান খাঁ নিজেই একজন জমীদার। নায়েব নবাবের কাছাকাছি বসিয়া সম্প্রতি অন্যলাগাও জমীদারীর লোকের সহিত তাঁহার জমীদারীর লোকের যে একটা দাঙ্গা হেঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহাই অবগত করাইতেছেন। নবাব খানিকটা শুনিয়াই অধীর ভাবে বলিলেন "ওসব থাক্, এমন মোদ্দাটা বল; খুন কটা হইয়াছে?"

নায়েব বলিলেন—"খুন একটাও হয় নাই। আমাদের জাহাঙ্গির খাঁকে শুধু খুব মারিয়াছে—আর সকলে পলাইয়া-ছিল মারিতে পায় নাই।"

খাঁজাহান খাঁ বলিলেন "জাহাঙ্গীর আমার চাকর হইয়া

মার খাইয়াছে—মারিতে পারে নাই—উহাকে আর একশ জুতা মার—আর ছাড়াইয়া দাও। এই কথা বল যদি মারিয়া আসিতে পারিত ত বকসিস পাইত—ও পদ বৃদ্ধি হইত।”

নবাব যে, প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন উল্লিখিত কথা হইতে তাহা যেন কেহ না মনে করেন। রাজাদিগের যুদ্ধবিগ্রহের ন্যায় দাঙ্গা হেঙ্গামাটা জমীদার-দিগের পক্ষে তিনি অনিবার্য্য মনে করিতেন। বোধ করি অনেক জমীদারেই এরূপ মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষুদ্রযুদ্ধে ভৃত্যের জয় পরাজয়ের সহিত তাঁহার নিজের মান অপমান আত্মমর্য্যাদা এতটা জড়িত মনে হইত যে কেবল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে উক্তরূপ শাস্তি দিতে তিনি বাধ্য হইতেন। তাহা ছাড়া, খাঁজাহান ঝোঁকওয়ালা স্বভাবের লোক, সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শুনিয়া তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কাজ করা তাঁহার পোষাইয়া উঠিত না, অতদূর তাঁহার ধৈর্য্য ছিল না—তিনি সব বিষয়ে একটা সংক্ষেপ নিষ্পত্তিতে আসিতে পারিলে বাঁচিতেন। সেই জন্য প্রথমটা তাঁহার শাস্তি প্রায়ই কঠোর হইয়া পড়িত, কিন্তু পরে তাহা সব বজায় থাকিত না।

কর্ম্মচারীগণ নবাবকে বিলক্ষণ করিয়া চিনিত, নায়েব বুঝিল নবাবের আর এসব শুনিতে ভাল লাগিতেছে না, এখন আর কিছু বলিতে গেলেই উল্টা উৎপত্তি হইবে, সে অন্য সময়ের জন্য উহা তুলিয়া রাখিয়া তখনকার মত

বিদায় গ্রহণ করিল। দাওয়ান তখন উঠিয়া দাঁড়াইল, নবাব বলিলেন "তোমার আবার কি বলিবার আছে ?"

দেওয়ান। "হুজুর প্রহরীদের অপরাধ তদারক করিয়া জানিলাম—দোষ হইয়াছে—"

নবাব। "সে বিষয়ে ত সন্দেহ ছিল না।"

দেওয়ান। "কিন্তু সকলের দোষ নাই।"

নবাব। "বেশীর ভাগের ত আছে ?"

দেওয়ান। "হুজুর বেশীর ভাগই নির্দ্দোষী।"

নবাব। "বেশীর ভাগই নির্দ্দোষী! আমি যে সকলগুলাকে একসঙ্গে হাত তুলিতে দেখিলাম—সব মিথ্যা হইয়া গেল"—

দেওয়ান। "হুজুর তাহা মিথ্যা নহে—"

নবাব। তবে তাহা কি! আমি ত তোমার কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

দেওয়ান। "তাহারা মারিতে হাত তুলে নাই। উহাদের দুজনকে তফাৎ করিয়া দিতে যাইতেছিল,"

নবাব দেখিলেন ইহাতে তাঁহার কিছু বলিবার থাকে না—আর রাগটাও তখন পড়িয়া গেছে,—তখন হেঙ্গাম করিবার ইচ্ছাও আর নাই। তিনি বলিলেন, "তবে দোষী কে ?"

দেওয়ান। "প্রধান প্রহরী মাদারী,"

দেওয়ানের সঙ্গে প্রধান প্রহরীর সঙ্গে বড় একটা বনি-

বমাও ছিল না,—দাওয়ান ভাবিতেন, প্রহরী তাঁহাকে যথোচিত মান প্রদান করে না, প্রহরী ভাবিত দাওয়ানও চাকর—সেও চাকর, দাওয়ানের কাছে কেন সে নীচু হইতে যাইবে। আসল কথা, প্রহরী দাওয়ানকে খাতির করিবার তেমন কারণ দেখিত না, বেগম সাহেরবানুর দাসী প্রহরীর পিশি, সুতরাং প্রহরী জানিত দাওয়ানের হাতে তাহার মার নাই। এ ঘটনার পর সে দাওয়ানের বিশেষ শরণাগত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দাওয়ান তখন ন্যায়ের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে হইল, তাহাকে বাঁচাইতে গেলে অন্য আর কাহাকেও বাঁচাইতে পারিবেন না। সুতরাং মাদারীর পক্ষ হইয়া কোন কথাই তিনি রাজাকে বলিলেন না। দেওয়ানের কথায় নবাব বলিলেন—

"কেন মারিতেছিল?"

দেওয়ান। "তাহা প্রহরীরা বলিতে পারিল না।"

নবাব। দাও তবে তাহাকেই দূর করিয়া দাও—মাদারী প্রধান প্রহরী হইয়া অবধি—আর নিস্তার নাই—কেবলি উহার নামের অভিযোগ দেখিয়া দিন কাটাও"

প্রধান প্রহরীর জবাব হইল, আর সকলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

স্মৃতি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাদারীর পিশি বেগম সাহের বানুর দাসী। সুতরাং মাদারী গিয়া অবধি নবাব বাড়ীর আর কিছুমাত্র সুশৃঙ্খলা নাই, অন্তঃপুরে ত যত রাজ্যের বিপদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন দিনে দুপুরে অন্তঃপুর হইতে অনায়াসে সাহার বানুর মাথায় দড়ি গাছটি পর্য্যন্ত চুরী যায়, বিড়ালে খোকাদের দুদ খাইয়া ফেলে, রাঁধুনীরা ভাল করি রাঁধে না, ধোপারা ভাল করিয়া কাপড় কাচে না, আবার রাস্তার লোক গুলা পর্য্যন্ত এমন বে-আদপ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদের চীৎকারের জ্বালায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে সাহের বানুর মহলে তিনি ঘুমাইতে পারেন না; এদিকে আবার কোলের ছয় মাসের খোকাটি প্রহরীর জন্য ভাবিয়া সন্ধ্যা না হইতে নিঃঝুমে এমনি ঘুমাইয়া পড়ে যে সারারাতের মধ্যে সে একবার জাগিয়া উঠে না;—বেগম ত মহা চিন্তিত হইয়া হাকিম ডাকাইয়া পাঠাইলেন,—হাকিম আসিয়া যখন বলিল ও কিছুই নয়, ও আরো স্বাস্থ্যের লক্ষণ,—তখন দাসী ত রাগিয়া ফুলিয়া উঠিল,—অমন হাতুড়ে চিকিৎসকের হাতে ছেলের যে রক্ষা নাই এ কথা স্পষ্ট করিয়া বেগমকে গিয়া বলিল, বেগম মহা কান্নাকাটনা লাগাইয়া দিলেন, শেষে আর এক চিকিৎসক

আসিয়া এমন ঔষধ দিয়া গেল—যে তাহা খাইয়া সমস্ত রাত খোকা কাঁদিয়া কাটাইয়া দিল—তখন বেগম সে বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু মাদারী না থাকায় অন্যান্য অসুবিধা যেমন তেমনই রহিয়া গেল। নবাবের ত প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ইহার উপায় খুঁজিয়া আকুল হইয়াছেন, একবার প্রহরীকে ছাড়াইয়া আবার তাহাকে ডাকিয়া আনিতেও তাঁহার মন উঠিতেছে না, অথচ ঘরের মধ্যেও এই অশান্তি, তিনি কয়দিন হইতে দারুণ মুস্কিলে পড়িয়াছেন। ইহার উপর আবার আর এক মুস্কিল আসিয়া জুটিল। সাহেবজান্ একদিন পালকী করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, তাঁহার প্রহরীগণ বেগমের সম্মান ঠিক রক্ষা করিতে পারে নাই, তাঁহার পাল্কীর সম্মুখ দিয়া একজন লোক চলিয়া গিয়াছিল। (এ ঘটনা বোধ করি পাঠকদিগের স্মরণ আছে—মহম্মদ মসীন বুড়ীকে প্রহরীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া কিরূপে সন্ন্যাসীর কাছে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।)

বেগম সাহেব তাহাতে এতদূর অপমানিত মনে করিলেন—যে রাগে গস গস করিতে করিতে পালকী হইতে নামিয়াই খাঁ জাহানকে অন্তঃপুরে তলব করিয়া পাঠাইলেন। যাহা বলিবার ছিল বলিয়া বলিলেন—"এমন অকর্ম্মা নারীর অধম দ্বারবানগুলা না রাখিলেই কি নয়—তার চেয়ে দুগ্ধপোষ্য বালক কতকগুলা রাখিলেই ত হইত।"

খাঁজাহানখাঁও মার মার কাট কাট করিতে করিতে বাহির বাটীতে আসিয়া প্রহরীদের ডাকিলেন। প্রহরীরাও আগে হইতে ভয়ে হাড়ে হাড়ে কাঁপিতেছিল, কেন না নবাব অন্য বিষয়ে যতই ক্ষমাবান হউন না কেন, বেগমদিগের লইয়া যেখানে কথা, সেখানে সত্যই খাঁজাহান খাঁজাহান হইয়া পড়িতেন। তাহারা প্রাণ হাতে করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, আপনাদের পক্ষে যতকিছু বলিবার ছিল, সব অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই,আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া নবাব বিশেষ নরম হইয়া পড়িলেন, ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিয়া তাহাদের এ যাত্রা একেবারে রেহাই দিলেন। এরূপ দোষে এরূপ পূর্ণ মার্জ্জনা তাহাদের আশাতীত, এরূপ দোষে তাহারা যখন অতি লঘু শাস্তি পাইয়াছে তখনও তাহাদের জরিমানাটা দিতে হইয়াছে, তাহারা এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় এতটা বিস্মিত হইল, যে সে বিস্ময়ে যেন তাহাদের আহ্লাদটা ঢাকিয়া গেল— তাহারা মুক্তি পাইল বটে কিন্তু তাহাদের আদর্শ ভাবের নিকট তিনি যেন নীচু হইয়া পড়িলেন। তিনি যদি এস্থলে প্রত্যেককে দশবিশ জুতা মারিয়া মহম্মদ নসীনের মাথা আনিতে হুকুম দিতেন তাহা হইলেই আর কি তাহাদের মতে ঠিক হইত। কিন্তু খাঁজাহানের আর যতই দোষ থাক তিনি বাস্তবিক সেরূপ ধরণের লোক ছিলেন না, তিনি যখন আসল কথাটা কি বুঝিতে পারিলেন—যখন

দেখিলেন—মহম্মদ মসীনের কাছে প্রহরীরা নিরস্ত হইয়াছে তখন প্রহরীরা তাঁহার চক্ষে দোষমুক্ত হইয়া গেল, এবং ইহার মধ্যে অপমানও তিনি বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কেবল আর একবার যে সত্যসত্যই মহম্মদের নিকট অপমানিত হইয়াছিলেন—এই সম্পর্কে তাহা মনে পড়িয়া গেল। তিনি যখন মুন্নাকে বিবাহ করিতে চান—তখন মতাহার ও মহম্মদ সে প্রস্তাব ত অগ্রাহ্যই করিয়াছিলেন—তাহার পর মহম্মদ নাকি বলিয়াছিলেন—মুন্নাকে ত আর বনবাস দিতে ইচ্ছা নাই।

হায়! তখন যদি মহম্মদ জানিতেন মুন্নার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট কিরূপ অন্ধকার তাহা হইলে কি আর একথা বলিতে পারিতেন। তখন মহম্মদের প্রাণের আশার উষালোকে সে অন্ধকার তিনি দেখিতে পান নাই। আলোকে আর সব দেখা যায় কেবল অন্ধকার দেখা যায় না। তাই মুন্নার ভবিষ্যৎ তখন মধুময় নির্ম্মল একখানি প্রভাতের মত তাহার মনে উদয় হইয়াছিল। তিনি জানিতেন না, তাঁহার মনের সে প্রভাত অন্ধকারের মধ্যেই শুধু প্রভাত হইয়াছে—অন্ধকারেই লয় পাইয়া যাইবে।

কে তোমরা অদৃষ্ট জানিতে চাহ, জানিয়া রাখ, তাহা দেখিতে হইলে—সুখশান্তি আশা ভরসার সমস্ত আলোকগুলি একে একে নিভাইয়া ফেলিতে হইবে, তখন সেই অন্ধকারের ভিতরে আর একটা এমন ভীম চরাচর

গ্রাসী স্থির অন্ধকার তোমার চোখে পড়িবে, যে প্রাণপণ সংগ্রামে—তাহাকে এক তিল নড়াইতে পারিবে না, সহস্র চেষ্টায় তাহার ভীষণতা একতিল কমাইতে পারিবে না—সে অন্ধকারের ভীমশক্তিতে পেষিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার জীবনপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে।

তাই বলিতেছি, কে তোমরা অদৃষ্ট জানিতে চাহ তাহা আর চাহিও না, জানিয়া রাখ তাহা আলোক নহে অন্ধকার—তাহা দেখা হইতে না দেখা ভাল।

বনবাসের কথা মহম্মদ বলিয়াছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু যখন খাঁজাহানের বিবাহ প্রস্তাব তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন তখন সে কথাও খাঁজাহানের সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। বিবাহে অসম্মতিই ত যথেষ্ট অপমান, তাহার উপর এই কথা! খাঁজাহানখাঁর গর্ব্বে দারুণ আঘাত লাগিল, মর্ম্মে মর্ম্মে এই অপমান তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার মনে হইয়াছিল—মহম্মদকে নীচ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত দিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু এ ঘটনার পর যে দিন নবাব নওরত উল্লা খাঁর বাটীতে আবার মহম্মদের সহিত তাঁহার দেখা হইল—মহম্মদ স্বাভাবিক সরলভাবে, হাস্য-মুখে যখন তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন—তখন তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি বুঝিলেন মহম্মদকে প্রতিশোধ দিতে

তাঁহার সাধ্য নাই, মহম্মদ তাঁহা হইতে উচ্চ হইতে যেন অতি উচ্চে বিরাজ করিতেছেন।

আসল কথা, খাঁজাহান নবাব হইয়াও সামান্য মহম্মদ মসীনকে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেন, মূর্খ শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতকে যেরূপ ভয়ে ভয়ে অথচ মান্যের ভাবে দেখে, সামান্য-হৃদয় লোকে মহান আত্মাকে যেরূপ তাচ্ছিল্য ভাবে দেখিতে গিয়াও ভক্তিভাবে দেখে, কে জানে কেন মহম্মদের প্রতি খাঁ-জাহানেরও সেইরূপ মনের ভাব। এভাব মন হইতে তিনি এত তাড়াইতে চাহেন, এভাব নিজের নিকটে স্বীকার করিতেও তিনি লজ্জিত হয়েন—তবু কেমন অজ্ঞাতভাবে এ ভাবটি তাঁহার মনে আধিপত্য করিতে থাকে। কেন যে এরূপ হয় তিনি দৃশ্যতঃ তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পান না। ধনে মানে, পদমর্য্যাদায় সকল বিষয়েই তিনি বড়—তবে কেন এই ভাব? কোন নিমন্ত্রণ সভায় অত লোক থাকিতে মহম্মদ আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলে তিনি কেন আপনাকে মাননীয় মনে করেন? মহম্মদের অভিবাদন পাইলে আপনাকে কেন শ্লাঘান্বিত মনে হয়? ইহার কারণ জাহানখাঁ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এইরূপ মনের ভাব হইতেই প্রহরীদের অতি সহজেই তিনি মার্জ্জনা করিলেন। মহম্মদ মসীন যখন খাঁজাহানের প্রতিশোধেরও উপরে তখন সামান্য প্রহরীরা যে তাহার নিকট পরাস্ত হইবে ইহা ত ধরা কথা।

এমন অনেকে আছেন বটে, যাঁহারা এরূপ অবস্থায় অন্যরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, উদোর ঘাড়ে বোঝা চাপাইতে না পারিয়া বুদোর ঘাড়ে সে বোঝা চাপাইয়া দেন, বউকে না মারিতে পারিয়া ঝিকে মারিয়া বসেন, প্রভু শ্বেতাঙ্গের কটুক্তির প্রতিশোধ দিতে না পারিয়া ভাত খাইবার সময় ব্যঞ্জনের দোষ পাইয়া গৃহিনীর উপর বিলক্ষণ ঝাড়িয়া লয়েন ;—কিন্তু মানুষও অনেক—স্বভাবও বিচিত্র,—সুতরাং উক্তরূপ স্বভাবটা আমাদের—বাঙ্গালীদের কাছে আদর্শনীয় হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু সকলের ওরূপ স্বভাব নয়—অন্ততঃ খাঁজাহানখাঁর ওরূপ স্বভাব ছিল না। একজনের দোষে অন্যকে প্রতিশোধ দিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, খাঁজাহানখাঁ যথার্থ ক্ষমতার স্বাদ পাইয়াছিলেন, সুতরাং বৃথা ক্ষমতার প্রকাশে তিনি সন্তোষ লাভ করিতেন না ; তাই বিনা শাস্তিতে প্রহরীদের মার্জনা করিলেন। প্রহরীরা চলিয়া গেল, খাঁজাহানখাঁ অনেকক্ষণ বাহিরে একাকী বসিয়া রহিলেন—কি যেন একটা কষ্টকর ভাবনা তাঁহার মনের মধ্যে উঠাপড়া করিতে লাগিল। বুঝি বা মহম্মদের পূর্ব্ব অপমানের স্মৃতিটা তীব্ররূপে মনে জাগিয়া উঠিল—একবার থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—“কেন এখনকার অপেক্ষাও কি ঘোর বনে গিয়া পড়িত।”

ইহার কিছুদিন পরেই শুনিতে পাইলেন, মুন্নার স্বামী

তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, মসীনও এখানে নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কথা বার্ত্তা।

সন্ধ্যার কিছু পরে একখানি নৌকা একটি দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া লাগিল, গাছে নৌকা বাঁধিবার জন্য অমনি দাঁড়িমাল্লারা তীরে লাফাইয়া পড়িল। নৌকার ভিতর হইতে একজন তখন মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—"মাঝি এত শীঘ্র লাগাইলে যে? এখানে কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে?" মাঝি বলিল—হুজূর একটা চড়ার কাছাকাছি আসিয়াছি—রাত্রে আর নৌকা চলিবে না।"

যিনি কথা কহিয়াছিলেন—তিনি সেই কথা শুনিয়া নৌকার বহির্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন—চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কিন্তু রবিবারের মধ্যে নদীর মোহানায় পৌঁছান চাই সেটী ভুলিও না, নহিলে করাচীর জাহাজ সেদিন আর ধরিতে পারিব না।"

মাঝি বলিল—"তা পারিব বই কি, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মহম্মদ আর কিছু উত্তর করিলেন না. নৌকা হইতে নামিয়া তীরে একটি গাছের ঝোপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, শ্বেত-নীল নির্ম্মল মেঘের উপর সপ্তমীর চাঁদের আধখানি মুখ শুধু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তবু রূপে ধরে না, লজ্জাবতী যুবতীর মত আধো ঘোমটার ভিতর হইতে সেরূপ উছলিয়া পড়িতেছে, সেই অস্ফুটরূপ-জ্যোতিতে শ্যামক্ষেত্রপ্রান্তর প্লাবিত হইয়াছে, দিগন্তের সীমা হারাইয়া গিয়া আকাশ পৃথিবী এক হইয়া গিয়াছে, সসীম অসীমে গিয়া মিশিয়াছে, ভাবের সৌন্দর্য্যে বিশ্ব ডুবিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে দিকে জ্যোৎস্নার এত রূপের ছড়াছড়ি, প্রাণঢালা হাসির উচ্ছাস, সেদিকে মহম্মদের দৃষ্টি নাই, তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে, মহম্মদের দৃষ্টি গঙ্গার উপর। এখানে আর জ্যোৎস্নার পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্য্য-ঘটা নাই, উভয় তীরের বৃক্ষাবলীর ছায়া পড়িয়া দুইদিক হইতে গঙ্গার জ্যোস্নালোককে এখানে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এখানে আলোক অন্ধকারে মিশিয়া নদীর জলে গ্রহণ লাগিয়াছে, ছায়া আলোকের অপূর্ব্ব মিলন চলিয়াছে—তাহা দেখিতে দেখিতে মহম্মদের মনে হইতেছে—

"পৃথিবীতে সকল বিষয়ে সারাদিনই বুঝি এইরূপ আলোক আঁধারের গ্রহণ লাগে, যেখানে আলোক সেই খানেই বুঝি অন্ধকার? যেখানে সুখ সেইখানেই বুঝি দুঃখ

জড়িত? একটি চাহিলে আর একটিকে বুঝি সঙ্গে সঙ্গে ধরিতেই হইবে। নদীর এই উপকূল সারাদিন বুকে আঁধার ধরিয়া আছে, একটু আলোক পাইবার জন্য কত না উহার আকুল বাসনা! কিন্তু এত চাহে বলিয়াই বুঝি আলোক উহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে না, অযাচিত-ভাবে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিয়া এই দীন-হীন ক্ষুদ্র-উপকূলকে ভিক্ষা দিতে গেলেই বুঝি উহার ধন-ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়? আলোকের আলোকত্ব লোপ পাইয়া যায়? যে আলোক ছিল সে ছায়া হইয়া পড়ে; উপকূলের অন্ধকার ঘুচাইবে কি, সে আঁধার আরো গভীর করিয়া তুলে! এই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম তবে?—আলোক চাহিলেই আঁধার আসে? সুখ চাহিলেই দুঃখ আসে!!!

জ্যোৎস্না-ধৌত নিশীথের-স্বপ্নের মত বিভাসিত সেই ঘুমন্তপ্রবাহিত-স্রোতস্বিনীর পানে চাহিয়া মহম্মদ বুঝিতে পারিলেন, যেখানে আলোক-আঁধার এক হইয়া গিয়াছে, যেখানে সুখ দুঃখ সব সমান, যেখানে সুখে আকাঙ্ক্ষা নাই, দুঃখে বিরাগ নাই, সেখানেই শান্তি বিরাজমান, এই আলোক আঁধারের স্বাতন্ত্র্য হীনতাই প্রকৃত স্থায়ী-আলোক, সুখ দুঃখের সাম্য-ভাবই প্রকৃত সুখ, তাহা ছাড়া আর সংসারে সুখ নাই।

সহসা মহম্মদের চিন্তা ভঙ্গ হইল, যেন পৃষ্ঠদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিলেন, চমকিয়া তিনি সেইদিকে মুখ

ফিরাইলেন, সহসা তাঁহার নিরাশ অন্ধকার হৃদয়ের সম্মুখে যেন শত শত আলোক জ্বলিয়া উঠিল; সেই নির্জ্জন অপরিচিত তটিনীতীরে অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রের মলিন জ্যোৎস্নালোকে সন্ন্যাসীর স্নেহময় পরিচিত প্রশান্তমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে বিভাসিত হইল। তিনি বিস্ময়ে আহ্লাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, সন্ন্যাসী যখন ধীরে ধীরে বলিলেন—"কেন বৎস আমাকে স্মরণ করিয়াছ?" তখন মহম্মদের চমক ভাঙ্গিল, তখন মহম্মদের মনে হইল, যাহা দেখিতেছেন, তাহা স্বপ্ন নহে, সত্যই তাঁহার সম্মুখে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী বলিলেন, "আবশ্যক হইলে আসিব বলিয়াছিলাম তাহা ভুলিয়া যাই নাই, কেন বৎস এত ব্যাকুল হইয়াছ?" সে স্নেহবাক্যে মহম্মদের হৃদয় উথলিয়া উঠিল, চোখে জল ভরিয়া আসিল, তিনি বালকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "গুরুদেব, তাহাকে একাকী রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে কেহ সান্তনা দিবার নাই, কেহ দেখিবার নাই, তাহার কষ্ট দূর করিবার কেহ নাই প্রভু, সে একাকী আছে।"

সন্ন্যাসী ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন "সেই শক্তিরূপ মহাপুরুষের অনন্ত অলঙ্ঘনীয় নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া চল। সেই নিয়মের বশে সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে যে ফল ভোগ করিতেছে তাহার নামই নিয়তি। সে নিয়তি খণ্ডন

করা কি তোমার আমার সাধ্য? তুমি সেখানে থাকিলেই কি তাহার দুঃখ ঘুচাইতে পারিতে? নিজের কর্ম্মফলে নিয়তির সৃষ্টি, নিজের কর্ম্মবলেমাত্র নিয়তির খণ্ডন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কেহ কাহাকে সুখী অসুখী করিতে পারে না, সুখ অসুখ সকলি নিজের হাতে, তবে অন্যে সুখ অসুখের পথ দেখাইয়া দিতে পারে এই মাত্র।”

সন্ন্যাসীর কথা মহম্মদের উদ্বেলিত হৃদয় স্রোতের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল, তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—“প্রভু ওকথা আপনার মুখেই সাজে, কিন্তু যাহারা সংসারের কঠোর বজ্রাঘাতে জরজর, যাহারা পরের একটি কথায় মরিয়া যায়, একটি কথায় বাঁচিয়া উঠে—তাহাদের কাছে ওরূপ কথা উপহাস মাত্র।”

স। “না বৎস সত্য কাহারো নিকট উপহাস হইতে পারে না। তবে সত্যকে মিথ্যা ভ্রম হইলে মাত্র তাহা হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ যাহা মিথ্যা তাহা সকল অবস্থাতেই প্রকৃত দুঃখের কারণ। সেজন্য সকল অবস্থাতেই এ ভ্রান্তি এ মিথ্যা সংসারী অসংসারী সকলেরি পরিহার্য্য। বিশেষতঃ এসত্যটি ধারণা করিতে পারিলে সংসার পীড়িতেরা যেমন উপকার লাভ করিবে তেমন অসংসারীরা নহে, কেননা যাহারা অসংসারী তাহারা কতক পরিমাণে দুঃখজয়ী হইয়াছে, কিন্তু যাহারা তাহা পারে নাই—যাহারা সংসারের দুঃখতাপে ঘোর মগ্ন—তাহারা যদি বুঝে

যে সুখ দুঃখের প্রকৃত স্রষ্টা নিজে ভিন্ন অন্য কেহ নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক কষ্ট লাঘব হইতে পারে।"

সন্ন্যাসী যাহা বলিলেন—একটু একটু করিয়া মহম্মদের হৃদয়ে যেন প্রবেশ করিল, কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—"সকল সময়ে এরূপ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" কতদূর দুঃখে মহম্মদ এইরূপ আত্মবিহ্বল, সন্ন্যাসী তাহা বুঝিলেন, তাঁহার করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি মৌন হইয়া রহিলেন, মহম্মদের সরল স্বচ্ছ গৌরবর্ণ মুখে বিষাদের কেমন মলিন ছায়া পড়িয়াছে, মস্তকের অতিশুভ্র মলমল পাগড়ির নীচে হইতে কুঞ্চিত কাল কাল লম্বা চুলগুলি মুখের উপর পড়িয়া সেই বিষাদময় ভাবের সহিত কেমন সুর মিলাইয়াছে, সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন। মহম্মদ থাকিয়া থাকিয়া বলিলেন—প্রভু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, "যদি পাপ হইতেই দুঃখের উৎপত্তি সত্য হয়—তবে যাহার জীবন এত পবিত্র, যে পাপ কাহাকে বলে জানে না, তাহার তবে কেন এত দুঃখ? আপনি বলিবেন এ জন্মের না হউক উহা পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মে যে পাপ করিয়াছে সে কি এ জন্মে এত পবিত্রমনা হইতে পারে? অন্ততঃ সেই পূর্ব্ব পাপজনিত পাপময়-ভাবও তাহার স্বভাবে লক্ষিত হইবে—নহিলে কর্ম্মের কোন নিয়মই দেখা যায় না।

সন্ন্যাসী। "তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা একরূপ ঠিক কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। পাপময় কর্ম্মফলে পাপময় প্রবৃত্তি এবং পুণ্যময় কর্ম্মফলে পুণ্যময় প্রবৃত্তি, এবং কোনরূপ বাধা না ঘটিলে অর্থাৎ পাপময় প্রবৃত্তিকে দমন না করিলে কিম্বা পুণ্যময়-প্রবৃত্তি কার্য্য করিতে বাধা না পাইলে, এই প্রবৃত্তি অনু-সারে আবার পাপ পুণ্য কর্ম্মের বিকাশ। সুতরাং যে দুঃখের সহিত পাপময় প্রবৃত্তিও দেখা যায় না তাহা পাপ কর্ম্মের ফল বলিতে পারি না।"

স। "যদি দুঃখ পাপের ফল ও সুখ পুণ্যের ফল নহে, তবে কর্ম্ম ফলের নিয়ম কি প্রভু বুঝিতে পারিলাম না।"

স। "যথার্থ দুঃখ ও যথার্থ সুখ—পাপ ও পুণ্য হইতে ঘটিয়া থাকে সত্য, "পাপ কর্ম্মবশাদ্দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখং—হিন্দুশাস্ত্রের একথাটি সূক্ষ্ম খাঁটি অর্থে ঠিক। কিন্তু সচরাচর লোকে সুখ দুঃখ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে সে সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কেননা সাধারণতঃ দুঃখ-কেই লোকে সুখ বলিয়া ভ্রম করে—আর সুখকে অনেক সময় দুঃখ বলিয়া মনে করে। সুতরাং সেখানে সে সুখ পাপের ফল, এবং সে দুঃখই পুণ্যের ফল সন্দেহ নাই। যেমন একজন দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহাতে আপনাকে সুখী বিবেচনা করিল—কিন্তু মনুষ্যত্ব নষ্ট না হইলে যে সুখ পাওয়া যায় না, যে সুখ জীবনের উন্নতি পথের কণ্টক—তাহা কি সুখ

বলিতে পার? প্রকৃত কথা এই, পাপ ছাড়া দুঃখই কোন নাই—কেননা পাপেই আমাদের অধোগতি—পাপ আর কিঁছুই নহে প্রকৃতির বিপরীত গতি মাত্র। সুতরাং পাপহীন দুঃখ দুঃখ-নামেরি বাচ্য নহে, অনেক দুঃখ দুঃখই নহে সুখের কারণ মাত্র। দুঃখ মাত্রেই যদি পাপ কর্ম্মের ফল হইত তাহা হইলে সহৃদয় করুণ ব্যক্তি মাত্রেই পাপী হইতেন। এই যে তোমার হৃদয় পরের দুঃখে এত দুঃখ অনুভব করিতেছে, অবশ্য ইহাও কর্ম্মফল সন্দেহ নাই—কিন্তু বল দেখি কত পুণ্যফলে এরূপ করুণ-মমতাময় হৃদয় একজন লাভ করিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে এ দুঃখ দুঃখই নহে, অতি পবিত্র আনন্দ লাভের উপায় মাত্র।"

স। "তাহা হইলে আমরা সুখ দুঃখের ভিন্ন অর্থ বুঝিতেছি, কষ্টের অনুভূতি মাত্রেই তাহা হইলে দুঃখ নহে।"

স। "অবশ্য নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য ক্ষণিক তৃপ্তিকর বা কষ্টকর অনুভূতি মাত্রকেই যদি সুখ দুঃখ বলা যায়, তাহা হইলে সুখ দুঃখের অর্থ যে কেবল সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে এমন নহে, সুখ দুঃখের যথার্থ অর্থই লোপ পায়। প্রথমতঃ বাসনা পাপময়ই হোক আর পুণ্যময়ই হোক—তাহা সিদ্ধ হইলেই একটি তৃপ্তিকর অনুভূতি লাভ হইতে পারে। একজন যে চুরী করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে সে

অবাধে কৃতকার্য্য হইলে তাহার ক্ষণিক আহ্লাদ হইতে পারে—তাহাকে কি তুমি সুখ বলিবে?"

ম। "তাহা বলিব না—কেননা ঐ অন্যায় কার্য্যের জন্য তখন সুখ হইলেও পরে তাহাকে এক সময় দুঃখ পাইতেই হইবে, এখানে না হয় পরলোক আছে।"

স। "বেশ, তাহা হইলেই দেখিতেছ দুঃখের সম্ভাবনা-বিহীন-স্থায়ী-আনন্দের নামই সুখ। সুতরাং যেরূপ জঘন্য তৃপ্তিকর অনুভূতিতে সেই সুখের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায় তাহাকে কিছু আর সুখ বলা যায় না বরং তাহাকে দুঃখই বলা যায়—কেননা সে সুখ আমার ভবিষ্যতের দুঃখের কারণ;—এইরূপ আবার যে দুঃখ হইতে স্থায়ী-সুখ লাভ করা যায় তাহাকে দুঃখ না বলিয়া অনায়াসে সুখই বলা যাইতে পারে। একজন তাহার কোন অন্যায় কর্ম্মে ব্যাঘাত পাইয়া—দণ্ড পাইয়া—দণ্ডের সেই কষ্ট হইতে যদি শুভ-মতি ফিরিয়া পায়—তবে সেই কষ্টই তাহার সুখের কারণ। এ হিসাবে যে অন্যায় কার্য্য করিয়া এড়াইয়া গেল—অন্যায়কেই সুখ বলিয়া বুঝিতে অবসর পাইল, সেই প্রকৃত ফাঁকিতে পড়িল। সুতরাং এস্থলে উল্লিখিত দুঃখই পুণ্যের ফল, এবং সুখ পাপের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে পাপময় প্রবৃত্তি ঘুচাইবার জন্যই পাপের ফল দুঃখময় হইয়াছে। যখনি আমরা মরীচিকাভ্রমে বিপথে সুখ ধরিতে যাই, অমনি দুঃখ আমাদের দংশন করে—

সেই আঘাত পাইয়াই আমরা ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করি। যতই কেন ঘোর পাপী হউক না—যখন সেই সঙ্গে তাহার এই দুঃখ অনুভবের কারণ ঘটিতেছে দুঃখ অনুভবের শক্তি রহিয়াছে তখন তাহার উঠিবারও আশা আছে, সুতরাং এই দুঃখ হইতে তাহার শুভ কর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার পাপের সঙ্গে যদি সে কিছু পুণ্য কর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে এরূপ দুঃখ আসিয়া তাহাকে সংশোধিত করিত না। যাহারা অন্যায় কর্ম্ম করিয়াও এইরূপ দুঃখের দংশন অনুভব করে না, তাহারাই যথার্থই অভাগা যথার্থ দুঃখী, কেননা জীবন-চক্রে উন্নতির সোপানে উঠিবার শক্তি তাহারা হারাইয়া ফেলিতেছে। এখন দেখিতেছ সুখ দুঃখ কিছুই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, সম্পূর্ণতাই মানুষের লক্ষ্য, উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য, তবে এই উন্নতির মূলে গৌণভাবে মাত্র সুখ বিরাজ করিতেছে, সুতরাং সুখের আশায় আমরা না ফিরিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করিবার জন্য এই উন্নতির দিকেই যদি আমাদের যথাসাধ্য শক্তি অর্পণ করি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুখও পাইতে পারি, আর সুখকে উদ্দেশ্য করিয়া বাসনা-চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইলেই আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে; তৃষ্ণার সহিত দুঃখের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি।”

মহ। “এখন দেখিতেছি, সকল দুঃখই যে পাপ-মূলক

তাহা না হইতে পারে, কিন্তু সকল দুঃখের অন্তরেই তৃষ্ণা বাস করিতেছে। আমি যদি ভালবাসিয়া ভালবাসা না চাই, আমি যদি সুখের তৃষ্ণায় কোন কাজ না করি, সুখ হউক দুঃখ হউক তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল কর্ত্তব্য ভাবিয়া কর্ত্তব্য করিতে পারি, তাহা হইলে আর কখনও নিরাশার কষ্ট আমাকে ভোগ করিতে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে তৃষ্ণাই দেখিতেছি সকল কষ্টের কারণ, এই তৃষ্ণা হইতে ক্রমে পাপ তাপ দুঃখ শোক সকলেরি উৎপত্তি, কিন্তু এ তৃষ্ণা নিবারণের উপায় কি প্রভু ?"

স। "বিষই বিষের ঔষধ। তৃষ্ণা হইতে দুঃখের উৎপত্তি, আবার দুঃখই সেই তৃষ্ণা নিবারণের উপায়। দুঃখে পড়িলেই পৃথিবীর স্থূল বিষয়ে সুখ নাই ক্রমে এই অনুভব করা যায়। এবং এই অনুভব হইতেই সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা হইতে পারে। সেই জন্য বলিতেছি অনেক সময় দুঃখই সুখ। কে বলিতে পারে, মুন্নার উন্নতির নিমিত্তই তাহার এ দুঃখ নহে ?"

মহম্মদের হৃদয় কি যেন শান্তিভাবে পুরিয়া গেল; এক-খানি কাল মেঘের ভিতর চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছিল, চাঁদখানি আবার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া প্রাণ ভরিয়া জ্যোৎস্না ঢালিল; সন্ন্যাসী সেই জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, মহম্মদের প্রশান্ত করুণা-পূর্ণ প্রেমময় নয়নে প্রাতঃশিশির বিন্দুর ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু শোভিয়াছে। সে অশ্রু আর কিছু নহে, সে আশার আনন্দাশ্রু—হৃদয়ের অপরিমিত স্নেহের উচ্ছ্বাস।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মুন্না সারাদিন প্রায় একাকী জানালার ধারে বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে গাছ পালার পানে চাহিয়া থাকে, মাঝে মাঝে হুহু করিয়া চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, কাহারো পায়ের সাড়া পাইলেই চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি সেথান হইতে চলিয়া যায়, শূন্য অট্টালিকার এঘর ওঘর করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঘরে যেন কাহাদের খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহাদের দেখিতে পায় না। গৃহময় তাহাদের পরিত্যক্ত কত চিহ্ন—অতীতের কত স্মৃতি, সুখ দুঃখের কত কাহিনী,—কেবল তাঁহারা নাই। তাহাকে দেখিয়া সেই স্মৃতি, সেই কাহিনী গৃহ ফাটাইয়া যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠে "না গো না তাঁহারা এখানে নাই।" মুন্না কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়া আবার তাহার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বাগানের গাছপালা গুলি মর্ম্মর শব্দে আবার সেই কথা কহিয়া উঠে, গঙ্গা কুল কুল করিয়া তাহাই বলিতে থাকে, মুন্না আর পারে না, উথলিত অশ্রু উৎস বুকে চাপিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে।

কিন্তু সে অশ্রু তাহার আর মুছাইবে কে? সে মর্ম্ম-বেদনায় তাহাকে আর সান্ত্বনা কে দিবে? তাহার আর আছে কে? এই অসীম বিশ্বসংসারে সে যে নিতান্ত অনাথিনী, নিতান্ত একাকী। তাহার স্বামী নাই, তাহার স্নেহের পিতা

নাই, তাহার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী একমাত্র ভাইটি কাছে ছিলেন, মুন্নার জীবনের শেষ জ্যোতিটুক নিভাইয়া দিয়া তিনি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন, তবে তাহার আর আছে কে? তাহার চারিদিকে কি ঘোর অন্ধকার, কি প্রাণ-শূন্যকারী নিরাশা!

চার পাঁচ মাস হইল মহম্মদ চলিয়া গিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদই নাই। তিনি যাইবার পর পিতার নিকট হইতে মুন্না একখানা পত্র পাইয়াছে কিন্তু তাহাতে মহম্মদের কোন কথাই নাই। দিন দিন মুন্নার বুকে পাষাণ-ভার বাড়িতেছে, দিন দিন তাহার ক্ষীণ-দেহ ক্ষীণ-তর হইতেছে—মলিন মুখকান্তি শীর্ণ বিবর্ণতর হইয়া পড়িতেছে।

সে যে নিরাশার বলে বল আনিয়া, পাষাণ বলে প্রাণ বাঁধিয়া তবুও ধৈর্য্য সহকারে আশার দিকে চাহিয়া আছে,—কিন্তু আরত সে পারে না। প্রতি দিন কত কষ্টে কত করিয়া, এক একটা দীর্ঘ যুগের মত খন বেলাটা শেষ হইয়া যায়, মুহূর্ত্ত পল গণিয়া গণিয়া সারাদিনের পর যখন সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুক দিগন্তে বিলীন হইয়া পড়ে—তখনও যে মহম্মদের কোন খবরই আসে না,—সে আর এমন করিয়া কত পারে? দিন দিন যে তাহার ধৈর্য্য একটু একটু করিয়া লোপ হইয়া আসিতেছে, আশা খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। যত দিন যাইতেছে তাহার মনে হইতেছে—

এইরূপ দিনের পর দিন যাইবে, মাসের পর মাস যাইবে—বৎসরের পর বৎসর যাইবে,—এই দগ্ধ হৃদয় লইয়া অনন্তকাল এই অন্ধকারের মধ্যে সে পড়িয়া থাকিবে তবু বুঝি আর কেহ আসিবে না, বুঝি আর মহম্মদ ফিরিবেন না,—বুঝি বা তিনি বাঁচিয়া নাই—” মর্ম্মান্তিক কষ্টে দুঃখে আত্মগ্লানিতে অবসন্ন হইয়া মুন্না ভাবিতেছে, “হায় কি করিলাম—কোথায় পাঠাইলাম ? আমার সুখের জন্য তাহাকে কোথায় বিসর্জ্জন দিলাম। সব গেল—সব গেল—কেহ রহিল না—বুঝি আর কেহ ফিরিল না !”

মহম্মদ সুখী হইবেন ভাবিয়া তাহাকে যে মুন্না যাইতে দিয়াছিল—সে কথা মুন্না ভুলিয়া গেছে, তাহার কেবল মনে হইতেছে তাহার নিজের সুখের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য সে মহম্মদকে মৃত্যুর হস্তে পাঠাইয়াছে।

বিকালের শেষ বেলা, রোদ পড়িয়া গিয়াছে, তবু গাছের মাথাগুলি এখনো যেন অল্প অল্প চিকচিক করিতেছে, বাসায় যাইবার আগে তেতালার চিলে ছাতের মাথায় কাকের রাশি দল বাঁধিয়া বসিয়া কাকা করিতেছে, বাগানের বড় বড় গাছের মাথায় মাথায় ছোট ছোট কত রকমের পাখীগুলি মনের সাধ মিটাইয়া একবার কিচির মিচির করিয়া লইতেছে। মুন্না এই সময় খোলা বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছে। প্রথম বসন্তের আরম্ভ, প্রেমের হাসির মত দক্ষিণ দিক হইতে ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, সে

স্পর্শে বাগানের মুদিত জুঁই বেল কলির মুখগুলি ঈষৎ ফুট' ফুট' হইয়া উঠিয়াছে, আম গাছ, নীচু গাছ, বাদাম গাছ, ঝাউ গাছের শাখাগুলি একত্রে মিলিয়া মিশিয়া, অল্প অল্প দুলিয়া দুলিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, বারান্দার পাশের বকুল গাছের শাখাটি হইতে এক একটি পাতা মর্ম্মর শব্দে খসিয়া খসিয়া মুন্নার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে; কামিনী গাছের ঝোপে লুকাইয়া একটা দোয়েল থাকিয়া থাকিয়া গান গাহিয়া উঠিতেছে, দূরে কোথা হইতে একটা কোকিল সপ্তমে তান চড়াইয়া তাহার প্রতিধ্বনি গাহিতেছে।

নীল আকাশের গায়ে নানা বর্ণের পাহাড় পর্ব্বত উঠিয়াছে, বাগানের সীমান্তে ঘন বদ্ধ বৃক্ষরাশির ফাঁক দিয়া আকাশগুলি সমুদ্রের অংশের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। মুন্না একদৃষ্টে তাহারদিকে চাহিয়া আছে, বুঝি ঐ সমুদ্রে মহম্মদ ভাসিয়া চলিয়াছেন, বুঝি এখনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। কই দেখা যায় না কেন? এত নিকটে তবু দৃষ্টি চলে না কেন? সীমার মধ্যে দাঁড়াইয়া একি অসীমের ব্যবধান? মুন্না একদৃষ্টে চাহিয়া বুঝি সে ব্যবধান ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

একজন দাসী কাছে আসিয়া বসিয়া তাহার চুলের রাশি লইয়া জটা ছাড়াইতে আরম্ভ করিল। ভোলানাথের স্ত্রী আসিয়া নিকটে বসিলেন, মসীন গিয়া অবধি তিনি

রোজ মুন্নাকে দেখিতে আসিতেন। মুন্না একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, আবার আনমনে সেইদিকে মুখ ফিরাইল। খানিক পরে আবার কাহার পায়ের শব্দ হইল, মুন্না চমকিয়া আর একবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইল, বাতাসের শব্দেও মুন্না আজ কাল চমকিয়া উঠে। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার চোখ'চোখি হইল—মুহূর্ত্তে মুখ ফিরাইয়া লইয়া মুন্না পূর্ব্বভাবে আকাশ পানে চাহিল। স্ত্রীলোকটি আস্তে আস্তে তাহার সম্মুখে আসিয়া বসিল। ভোলানাথের স্ত্রী বলিলেন—"কে গা তুমি ?"

সে বলিল—"কেউ নই গা—এই পাড়াতেই থাকি—আমার নাম ময়না। ইনিই বুঝি বিবিজি ?"

দাসী চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—"কেন গা তোমার সে খবরে কাজ কি গা ?"

অপরিচিতা বলিল—"খবর থাকিলেই খবরের দরকার, আর জিজ্ঞাসা করলে কি দোষ আছে নাকি—মরণ"

দাসী রাগিয়া গেল, চিরুণি খানি মাটিতে রাখিয়া বলিল—"তুই কে লা আমাকে গাল দিতে আসিস, আমার মরণ না তোমার মরণ—আঃ গেল যাঃ,"

ভোলানাথের স্ত্রী বলিলেন "চুপ কর মতি, ঝগড়া করতে আরম্ভ করলি কেন ?"

মতি চিরুণি খানা উঠাইয়া, আবার চুল আঁচড়াইতে

আরম্ভ করিয়া বলিল—"দেখ না—যেচে পরের বাড়ী ঝগড়া করতে এসেছেন।"

অপরিচিতা বলিল—আঃ মরণ, আমি ঝঁগড়া করছি না তুই ঝগড়া করছিস। দেখ দেখি মা রকম খানা—কোথায় ভাল কথা বলতে এলুম না দেখেই ঝগড়া করতে আরম্ভ করলে।"

দাসী আবার কি বলিবার উপক্রম করিল—ভোলানাথের স্ত্রী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—"কি বলতে এসেছ তুমি বল।"

সে বলিল "বড়ই ভাল খবর—শুনলে পরে এখনি ঐ মলিন বদন চাঁদ পারা হয়ে হেসে উঠবে"—

মুন্না এতক্ষণ অন্য মনে অন্য দিকে চাহিয়া ছিল—সহসা তাহার দিকে সচকিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল, প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল—পারিল না, ওষ্ঠে আসিয়া তাহা যেন বাধিয়া গেল, ভোলানাথের স্ত্রী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন, তিনিও উন্মনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহম্মদ মসীন সাহেব আসিতেছেন কি?"

তৃষিত ব্যক্তি যেমন জলের দিকে চাহিয়া থাকে—মুন্না সেইরূপ উতলা হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। অপরিচিতা একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"ও কি এমনিই ভারী খবর নাকি? না গো না—বিবিজি তোমাদের রাণী

হইবেন—খবর লইয়া আসিয়াছি। নবাব খাঁ জাহান খাঁ সাদির পয়গাম পাঠিয়েছেন”—

মুন্নার পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল—আবার পরক্ষণেই তাহা আরো পাণ্ডু হইয়া গেল, চোখ জলে পূরিয়া আসিল মুন্না মুখ নত করিল! অপরিচিতা বলিল—“হ্যাঁগা তা মুখখানি তুলে চাও—দুই একটা কথা কও, নবাবশাকে কি বলব দুট বলে দাও।”

দাসী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—ভোলানাথের স্ত্রীর কথা বন্ধ হইয়া গেল—ময়না আবার বলিল—“হ্যাঁ তা সরম লাগে বই কি, তা হোক দুট কথা বলে দাও।”

স্নিগ্ধ বিদ্যুতেও বজ্র লুকান থাকে, উষার আলোকেও তাপ নিহিত থাকে,—মুন্নার স্বভাবতঃ বিনম্র কোমল হৃদয়েও যে গর্ব্বটুকু লুক্কায়িত ছিল তাহাতে সবলে দারুণ আঘাত পড়িল—মুন্নার আর সহ্য হইল না,—মুন্নার জীবনে বুঝি সে এত অপমান বোধ করে নাই—এত ক্রুদ্ধ হয় নাই। কষ্টে দুঃখে—রোষে, অপমানে সে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কম্পিত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—“তাঁহাকে বলিও এখনো গঙ্গার বুকে আমার আশ্রয় আছে।”

মুন্না দ্রুতপদে সেখান হইতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধ করিয়া মাটির উপর গড়াগড়ি দিয়া—আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল—“মসীন ভাই আমার, এ সময়

একবার সাড়া দিবে না, না ডাকিতে আপনি আসিয়াছ—এখন আকুল হইয়া এত ডাকিতেছি—এক বার দেখিতে আসিবে না ভাই!" স্তব্ধ গৃহে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল—কঠোর দেয়ালের প্রাণও যেন সে আকুল ক্রন্দনে ফাটিয়া উঠিতে চাহিল, কিন্তু আর কেহ—কেহ আর সাড়া দিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুন্না চলিয়া গেলেন, স্ত্রীলোকটা অবাক হইয়া গেল। অমন ভাল কথা শুনিয়া কেন যে মুন্না রাগিয়া গেলেন, সে তাহা বুঝিতে পারিল না—সে বলিল—"বাবা ও কি মেয়ে গা—ভাল কথা বলতে অমন করে কেন? আমাদের যদি কেউ অমন কথা বলে ত আমরা তাকে মাথায় করে রাখি।" ভোলানাথের স্ত্রী বলিলেন—"হঁা গা তোমাদের এ কি রকম? বিধবা হলেও ত আমাদের বিয়ে হয় না, আর স্বামী বেঁচে থাকতেই তোমাদের বিয়ে!"

সে বলিল "কে জানে তোমাদের কেমন, আমাদের শাস্ত্র ওতে ভাল। স্বামীই যদি আমাকে ত্যাগ করে গেল ত সে বেঁচে থাক আর নাই থাক আমার আর তাতে কি?

দাসী বলিল—"তা মা তক্ষণি কি আর আমাদের সাদি

হয়, স্বামী মরে গেলে বল, ত্যাগ করলে বল—৪০ দিন আমাদের শোক করতে হয়।"

ভোলানাথের স্ত্রী বলিলেন—"হ্যাঁ সে অনেক কাল বই কি?—ততদিন যমে তোমাদের নেয় না কেন—আমি তাই ভাবি।"

অপরিচিতা বলিল—"যমে নিলে আর সাদি করবে কে? বলব কি তেমন কাঁচা বয়স নেই, নইলে স্বামী যতদিন মরেছে আবার দুট তিনটে সাদি এতদিনে হতে পারত।" বলিয়াই সে আকর্ণ বিস্ফারিত হাসি হাসিল—ভাবিল কি রসিকতাটাই করিয়াছে। সে হাসির বিকাশে পানের ছোবধরা বেগনি রংয়ের পুরু পুরু ঠোঁট দুখানির মাঝে আতা বিচির মত কাল কুচকুচে দাঁত দুই পাটি—(কবির ভাষায় বলিতে গেলে নীল ইন্দিবর মাঝে ভ্রমরবৎ)—আমূল বাহির হইয়া পড়িল,—কাল মুখে কাল দাঁতের ঘটা পড়িয়া গেল। হাসির ধমকে তাহার গা দুলিতে লাগিল, কানের একরাশ রূপার মাকড়ি নড়িতে লাগিল—হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিতে হাসিতে রূপার চুড়িভরা হাত দুলাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বারান্দা পার না হইতে হইতে সে হাসির চিহ্ন মাত্র আর রহিল না। যখন রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল, তাহার মনে অনেক রকম ভাবনা আসিয়া পড়িল। বড় মুখ করিয়া সে নবাবের কাজের ভার লইয়াছিল—সে মুখ তাহার কোথায় রহিল! দেওয়ান নাজানি

তাহাকে কি বলিবেন! এই মন্দ খবর লইয়া নবাব-বাটীতে যায় কি করিয়া!

যাইতে যাইতে রাস্তার মাঝে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রধান প্রহরীর সহিত তাহার দেখা হইল। এখন তাহার আর চাকরী নাই, ঘরেই বসিয়া আছে। নবাব বাড়ীর চাকরকে তাহার ঘরের কাছ দিয়া যাইতে দেখিলেই মহা আপ্যায়িত করিয়া তাহাকে সে এখন গৃহে লইয়া আসে, এক সময় যাহাদের উপর প্রভূত্ব করিত, দশ কোটী সেলাম করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে আপনার দুর্দ্দশা জানায়, এবং পুনর্ব্বার বহলের প্রত্যাশায় প্রত্যেকের কাছে একবার করিয়া আপনার সমস্ত জীবনটা চিরজীবনের জন্য বাঁধা রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহারা বাড়ীর বাহির হইবা মাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া শত গুণ আক্রোশে তাহাদের মুণ্ডপাতে নিযুক্ত হয়। ময়না যে নবাববাটীতে আসা যাওয়া করিতেছে, তাহা প্রহরী খবর পাইয়াছে—সেই জন্য আজ কাল সে তাহার মাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই প্রহরী মাসী মাসী করিয়া অস্থির হইয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিল। মাসীও আপনার দর বাড়াইতে ছাড়িল না,—এখানে বসিবার যে তাহার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই, নবাব যে তাহার জন্য হা প্রত্যাশ করিয়া বসিয়া আছেন, বিশেষ করিয়া সে কথা প্রহরীকে জানাইয়া দিয়া তাহার প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি

প্রকাশ করিল—এবং এই আপত্তির মধ্যেও বিনা আপত্তিতে অগ্রসর হইয়া তাহার বাড়ী আসিয়া বসিল। আসলে নবাব বাড়ী যাইবার জন্য সে যে বড় একটা উৎকণ্ঠিত ছিল তাহাও নহে, বরং যতক্ষণ না যাইতে হয় আপাততঃ সে তাহাই চাহে। মন্দ খবরটা লইয়া যাইতে তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে।

এখানে আসিয়া হিন্দুস্থানিতে তাহাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল, আমরা বাঙ্গলা করিয়াই তাহা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। এ কথা সে কথার পর প্রহরী বলিল "মাসি-জি কি হোল কি?" নবাববাড়ীতে চাকরীর চেষ্টার জন্য প্রহরী অনেক করিয়া মাসীকে বলিয়া দিয়াছিল, মাসীও তাহাকে বিধিমতে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, এমন কি প্রহরীর চাকরীর ভাবনায় তাহার যে সারারাত ঘুম হয় না এ পর্য্যন্ত তাহকে বিশ্বাস করাইয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। অথচ সে কথাটা তাহার স্মৃতির ত্রিসীমাতেও ছিল না, রাত জাগিয়া জাগিয়া বোধ করি মাথার ব্যাম উপস্থিত হওয়াতে স্মৃতিটা এইরূপ বিকল হইয়া থাকিবে; সুতরাং প্রহরী যাহা ভাবিয়া ঐ কথা বলিল, ময়না তাহা বুঝিল না, ময়নার মনে যেরূপ কথা আনচান করিতেছিল, সে সেইরূপই বুঝিল,—সে বলিল "আর কি হোল! মেয়ে না ত যেন আস্ত বাঘ। কথা বলতে গিলতে আসে, তা এর মধ্যে এ

খবর তুই কি ক'রে পেলি? এত কেউ জানার কথা নয়”

প্রহরী বড় চতুর, বুঝিল একটা কিছু ব্যাপার আছে, বাহির করিয়া লইবার ইচ্ছায় বলিল “হঁ্যা আমি আবার জানব না, সব কথা আগে আমার কাছে। তা মেয়েটা কি বল্লে?”

ময়না। “এমন লক্ষ্মীছাড়া ডাইনি মেয়ে দেখিনি—কোন মতে সে সাদি করতে চায় না।”

প্রহরী আন্দাজে একরকম সব বুঝিয়া লইল, বলিল—“তাইত বড় তাজ্জব! তা কোথাকার মেয়েটা বল দেখি মাসী।”

ময়না। “সব জানিস ওটা জানিসনে! এই যে ওই বড় বাড়ীর মুন্না বিবিজি, মহম্মদ মসীনের বোন।”

প্রহরীর দাঁতে দাঁতে লাগিল, প্রহরী বলিল “জানি জানি তার পর?”

ময়না। “তার পর আর কি? এখন নবাবসাকে গিয়ে বলি কি বল দেখি?”

প্রহরী বলিল “বল, আর কিছু নয় একবার হুকুমের মাত্র অপেক্ষা।”

ময়না বলিল 'কথাটা ত মন্দ নয়! তাইত বলি বোনপো নইলে কারো ফন্দি এসে না—কিন্তু পারবি কি?”

প্রহরী ভীষণ ভ্রুকুটি করিল—দাঁতে দাঁতে আর একবার

কিটি মিটি করিল—তাহার পর বলিল "কেন পারিব না ? তাহার বোনকে ধরিয়া আনিব, তাহাকে পাইলে মুণ্ড-পাত করিতাম, বদমাস কাফের !"

ময়না বলিল "কাফের কি রে সে যে মুসলমান ?"

প্রহরী। "সে কাফের নয় ! তাহার আমলা কাফের, তাহার গমস্তা কাফের, তাহার গাইয়ে কাফের, তার যত সব কাফের ! তার রক্ত পান করিতে পারিলে সব পাপ আমার মোচন হইবে।"

ময়না বলিল "তবে তাই তুই করিস—আমি এখন নবাবের বাড়ী যাই।"

প্রহরী বলিল "দোহাই মাসী ভুলিও না, বলিও তাঁহাকে, এ বান্দা থাকিতে তাঁহার কোন ভাবনা নাই, কেবল চরণে একটু স্থান পাইলেই হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উত্তেজনা।

সংসারে দুর্লভ হইলেই বুঝি দ্রব্যের গৌরব, বাধাতেই বুঝি ভাবের স্ফূর্ত্তি ! খাঁজাহান খাঁ যখন শুনিলেন, মুন্না তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত, তখন তাঁহার নিকট মুন্নার গৌরব আরো বাড়িয়া উঠিল, প্রতিহত হইয়া তাঁহার বাসনা আরো উথলিয়া উঠিল।

মুন্না যে তাঁহার প্রার্থনা এখন অগ্রাহ্য করিবে—তাহা জাহান খাঁ মনেই করেন নাই, অভাগিনী অনাথিনী পরিত্যক্তা মুন্না এই অবস্থায় এখনো যে রাজরাজেশ্বর নবাব খাঁজাহানের পত্নী হইতে অস্বীকার করিবে—ইহা তিনি কিরূপে মনে করিবেন! এ সংবাদে সহসা তাঁহার আশার বুকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, আত্মাভিমানে ভীষণ আঘাত লাগিল, তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় সে নৈরাশ্য, সে আঘাত ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, মনের মধ্যে মুন্নার যে সাধের ছবি আঁকিয়াছিলেন, ক্রোধের অনলে তাহা ভস্মীভূত করিতে প্রয়াস পাইলেন, প্রবাহিত বাসনা-স্রোতকে সবলে জমাট বাঁধিতে ইচ্ছা করিলেন—কিন্তু কিছুই হইল না; মুন্নার সে দিব্যছবি আরো জ্বলন্ত মহিমায় তাঁহার মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল—বদ্ধ বাসনার স্রোত সহস্র গুণে প্রবল হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি তাহার মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

খাঁজাহানের কথনো যে ভালবাসার অভাব ছিল এমন নহে, যখন যাহাকে নূতন বিবাহ করিয়াছেন, তাহার প্রেমেই তখন ভরপূর হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু কোন প্রেমে আর কথনো তাঁহার হৃদয়ে এরূপ আগুণ জ্বলে নাই, এই নবোদিত প্রজ্জ্বলন্ত আগুণের নিকট সে সকলি যেন নিস্তেজ, প্রশান্ত, শীতল বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

নবাবের আজ্ঞামতে ময়নাই তাঁহার কাছে খবর লইয়া

আসিয়াছিল,—সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার নিরাশ-প্রকটিত ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল, তাহার তীব্র দৃষ্টিতে নবাবের অন্তর ভেদ হইল—সে তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া আস্তে আস্তে বলিল,"এখনো ত উপায় আছে"

নবাব শা চমকিয়া উঠিলেন—সেখানে যে আর একজন কেহ আছে—সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বাহিরের অস্তিত্ব তাঁহার কাছে যেন লোপ পাইয়াছিল। সচকিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন—নীরব ভাষায় যেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপায় ?"

সে বলিল—"হুজুর ! আপনার দাসানুদাস ভৃত্য মাদার আলি আপনার হুকুমে হাজীর আছে—হুকুমের মাত্র অপেক্ষা—"

নবাবের প্রোজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় একবার বিস্ফারিত হইল মাত্র, কিন্তু তিনি কোন কথাই কহিলেন না—কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না,—আবশ্যকও ছিল না, মনে মনে দুজনে দুজনকে বুঝিতে পারিলেন।

এমন অনেক কাজ আছে যাহা আপনার নিকটে প্রকাশ করিতেও মানুষের ইচ্ছা করে না, ইহাও সেইরূপ একটি। সে কাজ করিতে করিতেও মানুষ ইচ্ছা করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতে চাহে, যেন তাহাতেই তাহার দূষণীয়তা ঢাকা পড়িয়া যাইবে।

ময়না বুঝি নবাবের সঙ্কোচ বুঝিতে পারিল,—সে সাহস

করিয়া বলিল "তাহাতে ত দোষ কিছুই নাই—শেষে আপনিই বশ হইয়া যাইবে"

কাজটার দোষ যাহা কিছু আর যদি কিছু থাকে ত যেন কেবল ঐ ভয়টা। ময়না ভাবিল—ঐ জন্যই নবাবের যত বুঝি সঙ্কোচ। কিন্তু কথাটা বোধ করি নবাবের তত ভাল লাগিল না—তাঁর কপালে রেখা পড়িল—তিনি ক্রোধ কটাক্ষে ময়নার দিকে চাহিলেন, সে তখন আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, অভিবাদন করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। দাওয়ানকে গিয়া মনের কথা ভাল করিয়া খুলিয়া বলিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার সমস্তই চলিয়া গেল না, সে যে কথা বলিয়া গিয়াছিল—ঘরের মধ্যে সেই কথাগুলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল,—নবাব শিহরিয়া উঠিয়া সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

একই কথা।

সলেউদ্দিন চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একটি পয়সা ঘরে রাখিয়া যান নাই, দেনায় সকল ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবশিষ্ট যথা সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল, তবু দেনা শোধ হইল না, পাওনাদারেরা শেষে বসতবাটী

পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মহম্মদেরও কিছু নাই, জাহাজ মারা পড়ায় সমস্ত লোকসান হইয়া গিয়াছে, তিনি থাকিলেও বা এ সময় যাহা হউক একটা ব্যবস্থা হইত—কিন্তু তিনিও এখানে নাই, মুন্না একেবারে নিঃসহায়, নিরাশ্রয়। দুদিন পরে যে কোথায় মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইবে—তাহারও একটা ঠিকানা পর্য্যন্ত নাই। বুঝি সে অনাথিনী-বালিকা অদৃষ্টের দোর্দ্দণ্ড তোড়ের মুখে, বাত্যাহত কুটাগাছটির মত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতে চলিল!

একথা খাঁজাহান খাঁ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মনে আর একবার আশার সঞ্চার হইল।

নবাবের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, দাওয়ানজির মনেও তাহাতে বড় ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। নবাবের মনের গতি তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলে লাভের ত কথাই নাই, না পারিলেও সহানুভূতি দেখাইবার এই উত্তম অবসর—তিনি সুযোগ পাইয়া নবাবকে বলিলেন, "হুজুর বলেন ত আর একবার প্রস্তাব করা যায়, মেয়েমানুষ দর্প চূর্ণ না হলে' বশ হয় না, এবার আর কোন মার নেই।"

নবাব শা নিজেও উহা মনে করিতেছিলেন।

আর একবার রীতিমত মুন্নার নিকট প্রস্তাব পাঠান হইল, কিন্তু দুই একদিন পরে আবার যখন দেওয়ান

খোঁতামুখ ভোঁতা করিয়া নবাবকে আসিয়া বলিলেন—মুন্না এখনো অসম্মত, তখন নবাবের আর সহ্য হইল না, তিনি রাগিয়া বলিলেন—"একজন সামান্য স্ত্রীলোকের কাছে বার বার এই অপমান! কে তোমাকে এমন কাজ করিতে বলিল?"

দাওয়ান বলিতে পারিত—"আপনিই বলিয়াছিলেন" কিন্তু সে কথা হজম করিয়া বলিল—"হুজুর কসুর হইয়াছে, মাপ করিবেন। কিন্তু এ অপমানের কি আর প্রতিশোধ নাই।"

নবাব। "প্রতিশোধ! সামান্য স্ত্রীলোকের উপর প্রতিশোধ লইয়া তোমরা বীরত্ব মনে করিতে পার—আমি করি না।"

দেওয়ান। "আমি তাহা বলিতেছি না। ইচ্ছা করিলে আপনার মনস্কামনা এখনি পূর্ণ হইতে পারে, হুকুমের মাত্র অপেক্ষা"—নবাব একবার পূর্ণ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন, ময়না যাহা বলিয়াছিল 'সেই একই কথা'। কিন্তু এবার আর নবাব শা শিহরিয়া উঠিলেন না—তিনি বলিলেন—"কিন্তু জোর করিয়া কি হৃদয় পাওয়া যায়?"

দাওয়ান। "হুজুর—একথা যখন আপনি বলিতেছেন—আমার আর কথা চলে না। কিন্তু আপনি কি জোর করিয়া হৃদয় লইতে যাইতেছেন? আপনি কি আপনার প্রাণ মন দিয়া পূজা করিতে ব্যগ্র হইয়া নাই? হৃদয় দিয়া হৃদয়

পাইবেন না—এ কি কাজের কথা? নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে কি তাচ্ছিল্য করিতে পারিয়াছিলেন?"

নবাব বলিলেন—"কিন্তু?"

দাওয়ান। "বুঝিয়াছি—আপনি বলিতেছেন—ইহা দোষের কাজ। কিন্তু নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবেন ইহাতে দোষ কোথায়? যদি পরেও তাহার ইচ্ছা না হয়—না হয় বিবাহ নাই করিবেন, তাহার অদৃষ্টে না থাকে, আবার পথের ভিখারিণীকে পথে ছাড়িয়া দিবেন—তাহা হইলে ত আর কোন দোষ হইবে না।"

নবাবের আর কিছু বলিবার রহিল না। আসল কথা, ঐরূপ একটা যুক্তির জাল দিয়া সুবুদ্ধিকে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য খাঁজাহান খাঁ উন্মুখ হইয়াছিলেন, বুঝি কেবল একটা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না; এখনো অন্যায় জানিয়া শুনিয়া একটা অন্যায় করিতে তাঁহার মন উঠিতেছিল না। আর কিছু নহে, বোধ করি উহা কেবল অনভ্যাসের সঙ্কোচ, ওরূপ কাজ তিনি আর কি আগে কখনো করেন নাই। তবে কিছু দিন আরো যাইতে দিলে—হয়ত বা এ সঙ্কোচটুকও আর মনে স্থান পাইত না, কেন না প্রবৃত্তি একবার যাহাকে দাস করিয়াছে—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা তাহার আর কতদিন থাকে।

দাওয়ান তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াছিল, তাঁহার বাসনা তৃপ্তি করিবার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া যদি সে সঙ্কোচ ঘুচাইয়া

দিতে পারে—ত নবাব যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা সে বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াই ওরূপ কথা বলিল, নহিলে ন্যায়ের জন্য তাহার বড় একটা মাথা ব্যথা পড়ে নাই।

নবাব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"আচ্ছা এখন যাও, পরে যা হয় বলিব।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রবৃত্তি।

দেওয়ান চলিয়া গেল, নবাবের মনে নানা কথা তোলপাড় করিতে লাগিল, নানা দুর্দ্দমনীয় তর্ক বিতর্ক উঠিতে লাগিল। আজ বলিয়া নহে যেদিন ময়না ঐ কথা বলিয়া গিয়াছে, সেদিন হইতে তাঁহার মনের মধ্যে ঐরূপ একটা বিপ্লব চলিয়াছে, সেই দিন হইতে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে কে যেন দিনরাত উত্তেজিত করিতেছে—তিনি সমস্ত হৃদয়ের বল একত্র করিয়া দিনরাত তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। সেই দিন হইতে অন্তঃপুরের প্রমোদ কোলাহল নবাবের আর তেমন ভাল লাগে না, তিনি মাঝে মাঝে নির্জ্জন নিকুঞ্জে, বাগানে, গাছ পালার মধ্যে একাকী আসিয়া বসেন, হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠেন, সেই নিকুঞ্জের পবিত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে

যেন বলিয়া উঠে "তাহাতে দোষ কি?" নিস্তব্ধ গম্ভীর রজনীতে গভীর নিদ্রার মাঝখানে হঠাৎ যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, অমনি যেন শুনিতে পান, "তাহাতে দোষ কি?" তিনি অমনি বিবেকের উচ্চস্বরে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া সেই বিদ্রোহীস্বরকে ডুবাইয়া ফেলিতে চাহেন। সেই দিন হইতে জাহানখাঁর আর শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, সেই দিন হইতে তাঁহার দুই আমির মধ্যে অনবরত বিবাদ চলিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে আর কখনো পড়িতে হয় নাই, অভ্যাসের মায়াকাটির স্পর্শে তাঁহার হৃদয় এখনো পাষাণ নিষ্ঠুর হইয়া পড়ে নাই, অনুতাপহীন চিত্তে স্বার্থের চরণে হৃদয় বলি দিতে এখনো তিনি নিপুণ হয়েন নাই, তাই প্রবৃত্তি তাঁহার কাণে কাণে অনবরত উত্তেজনার এই মহামন্ত্র জপিতেছে।

কিন্তু আজ আর তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না, এতদিন যে সংশয়ের কাছ হইতে ভয়ে দূরে পলাইয়া যাইতেছিলেন আজ তাহাকেই যুক্তি বলিয়া ধরিলেন, আজ চোরাবালীকে কঠিন মাটি বলিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলেন, আজ তিনি ভাবিলেন—"সত্যইত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিব তাহাতে দোষ কি; হৃদয় প্রাণ দিয়া পূজা করিব—ইহা কি দোষের হইতে পারে, সে পূজা কি কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে?—না তাহা নহে, তাহা হইতে পারে না, পারে না।"—বার বার করিয়া তাঁহাকে কে

বলিতে লাগিল—"না তাহা নহে, তাহা হইতে পারে না।" এ কথায় আজ আর তিনি উত্তর দিতে পারিলেন না, আজ তিনি তর্কে হারিয়া গেলেন, যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন—তাঁহার যথার্থ আমি আজ প্রবৃত্তিরূপ ক্ষুদ্র আমির কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম হইয়া ডুবিয়া গেল, মহান তিনি প্রবৃত্তির স্রোতে আজ আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন—আজ তিনি নিজের নিকট নিজে প্রতারিত হইলেন। বাসনার অতীত, প্রবৃত্তির অতীত, স্বার্থের অতীত মনুষ্যের যে অন্তর দেশ আছে যদি সেই নিভৃত অন্তরে লুকাইয়া অনুসন্ধান করিতে পারিতেন ত খাঁজাহান বুঝিতে পারিতেন—তিনি কিরূপ প্রতারিত। কিন্তু আত্ম পরীক্ষা করিতে তাঁহার সাহস হইল না, তিনি সেদিক হইতে সভয়ে মুখ ফিরাইলেন। সূর্য্যের আলোকে যেমন সহস্র তারকা হীনজ্যোতি হইয়া পড়ে, এক বিলাসিতার প্রাবল্যে তাঁহার অন্য সহস্রগুণ নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তাঁহার চারিদিক অন্ধকার করিয়া দিয়া একে একে সে সব যেন নিভিয়া গেল; তাঁহাকে আর কিছু দেখিতে শুনিতে দিল না, এতদিন তিনি অজ্ঞাতভাবে দিন দিন যে আবর্ত্তের দিকে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন—আজ অন্ধকারে একেবারে হুড়মুড় করিয়া তাহার মধ্যে পড়িয়া গেলেন; আর উঠিবার শক্তি রহিল না।

কে তুমি মানব প্রবৃত্তি জয় করিতে চাও,—সাবধান!

এইরূপ করিয়াই লোকে অগ্রসর হয়, এইরূপেই লোকে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, প্রবৃত্তির ভয়ানক আবর্ত্ত-পথের প্রথম সীমায় একবার পা বাড়াইলে—অবস্থাচক্রের ঘূর্ণ তোড়ে একেবারে শেষ সীমায় আনীত না হইয়া চেতনা জন্মে না! চেতনা হইলেও তখন আর বল থাকে না, বল থাকিলেও অবসর থাকে না, জানিয়া শুনিয়া সাধ করিয়া তখন বহ্নিমুখগামী পতঙ্গের ন্যায় প্রবৃত্তির আগুণে পুড়িয়া মরিতে হয়—বুঝি আর ফিরিতে পারা যায় না। সাবধান! প্রবৃত্তির অঙ্কুর যেন কখনো ফুটিয়া উঠিতে না পায়।

হায়! কে বলিতে পারে এইরূপে কত দয়ার্দ্রচেতা নিষ্ঠুর হইয়াছে, কত পুণ্যাত্মা পাপী হইয়াছে, কত রত্নে কলঙ্ক পড়িয়াছে!

আজ যে পাষণ্ড, মনুষ্য রক্ত পান করিয়া আহ্লাদে হাস্য করিতেছে, হয়ত একদিন পরের এক বিন্দু অশ্রু দেখিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইত; আজ যে রাক্ষসী জঘন্য পৈশাচিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া জীবন কাটাইতেছে, হয়ত একদিন পাপের ক্ষুদ্র দৃশ্য মনে করিতেও সে শিহরিয়া উঠিত, কে জানে একটা রাক্ষসী-প্রবৃত্তির হস্তে পড়িয়া অবস্থাচক্রে উহাদের এই দারুণ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন নহে?

জাহান খাঁ—কে বলে তুমি ক্ষমতাবান? প্রবৃত্তির হাতে যে একটা সামান্য খেলানা, কুটার মত ফুঁয়ে উড়াইয়া

প্রবৃত্তি আপন পদতলে যাহার সর্ব্বস্ব চূর্ণ চূর্ণ করিল, সেত দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বল! সংসারে কে না দুর্ব্বল, তবে যিনি আপনার দুর্ব্বলতাকে চিনিয়া ঘৃণা করিতে পারিয়াছেন—তিনিই ক্ষমতাবান। কিন্তু খাঁজাহান যে মুহূর্ত্তে নিজের দুর্ব্বলতার উপর তোমার ভালবাসা জন্মিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি মৃত্যুকে জীবন বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছ, ক্ষমতাকে স্বহস্তে চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়াছ!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতা।

কুটীরে মাতা পুত্রে কথা হইতেছিল।

বুড়ি মা কহিল "হাজার টাকা! কত সে? কগণ্ডা?"

ছেলে কহিল—"ক গণ্ডা অত আমি জানিনে, গণ্ডা ফণ্ডা ক'রে সে গোণা যায় না"

বুড়ি বলিল—"তবু এই গণ্ডা কুড়িক হবে?

ছেলে। "তার ঢের বেশী"

বুড়ি। "তার ঢের বেশী? সে তবে কাহন নাকি? ও পাড়ার ফতেখাঁর আয়ির নাকি কাহন ভোর ধন ছিল, কিন্তু তা কেমন চক্ষে ত কখনো দেখিনি!"

ছেলে। "উঁ হুঁ তারো বেশী।"

বুড়ি। "তারো বেশী! তবে গুণব কি ক'রে?"

বুড়ির মহা ভাবনা হইল, ছেলে বলিল "তা নাইবা গুণলি"

বুড়ি ফোগলা মুখ খুলিয়া শিশুদের মত সাদাসিদে ধরণে চাহিয়া রহিল, এমন আজগুবে কথা যেন সে কখনো শুনে নাই, তাহার পর বলিল "ওকি কথা বলিস, না গুণলে সব থিতব কি ক'রে? এই দেখ না—ঘরখানি ছাইতে কোন পাঁচগণ্ডা না লাগবে? তার পর বউ একটি আনতে হবে, সেই বা কোন পাঁচ গণ্ডার কমে হবে? টাকার জন্য এত-দিন বউএর মুখ পর্য্যন্ত যার দেখতে পাইনি।" বলিয়া বুড়ি দুই এক ফোঁটা চোখের জল মুছিল।

ছেলে বলিল—"আবার প্যান প্যান আরম্ভ করিস নে, সে সবই হবে—"

বুড়ি। "শুধু সে সব হলে ত চলবে না, আমার একটি বউ, ঘরে যে আনব—, দু এক খানা গহনাও ত দিতে হবে, রূপার না হ'ক কাঁসার দু চারখানও ত চাই। একজোড়া পাঁইজোড়, মল, চুড়ি, তাবিজ, সিঁতি, এ না দিলে কিন্তু আমি মুখ দেখাতে পারব না।"

ছেলে। "ওতে কত লাগবে?"

বুড়ি—"সে দিন বক্সির মা বউএর জন্য ঐ সব কিনেছে, গণ্ডা দুই তার খরচ হয়েছে—"

ছেলে। "সে ত ভারী, তোর বউকে অমন গণ্ডা গণ্ডা গহনা দিতে পারবি—"

বুড়ি। (মহা আহ্লাদে) বলিস কি ? তবে কিন্তু আর কিছু না হোক্ পাঁইজোড়টা রূপার দিতে হবে—বউ আমার রূপার পাঁইজোড় পরে কেমন ঝুম ঝুম করে বেড়াবে। ১০ গণ্ডা টাকায় সে বেশ হবে—

ছেলে। "তা দেওয়া যাবে"

বুড়ি। "তা দেওয়া যাবে! তবে তাবিজটাও কেন রূপার হোক না ? পাঁচ গণ্ডায় সে দিন একজোড়া ও পাড়ার মতির মা গড়িয়েছে—"

ছেলে বলিল—"আচ্ছা তা দিস"—বুড়ীর তখন আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না—সে একে একে তখন সমস্ত গহনাগুলিই আগে রূপার করিবার বন্দবস্ত করিয়া ফেলিল, তাহার পর সত্যই যেন সে টাকা গুণিতেছে এইরূপ ভাবে শূন্য মাটীর উপর হাত রাখিয়া এক একটা গহনার জন্য গণ্ডা গণ্ডা করিয়া টাকা ভাগ করিয়া রাখিতে লাগিল, ভাগ করিতে করিতে বলিল—"হাঁরে আলি এত ধন কড়ি কোথায় পেলি তুই ?"

ছেলে বলিল—"পেলুম আর কই, পাব বল ?"

বুড়ি। "তা ও একই কথা। না হয় পাবি, তা' কে দেবে কে বাবা ?"

ছেলে। "খা জাহান খাঁ।"

বুড়ি। "খাঁ জাহান খাঁ। জয় হোক তাঁর। তা কেন দেবে বল দেখি ?"

ছেলে চুপ করিয়া রহিল। মা বলিল, "চুপ করলি যে ?"

ছেলে বলিল—"অমনি কি কেউ টাকা দেয়—কাজ করতে হবে।"

বুড়ি। "কি কাজ বাবা ?"

ছেলে। "তোকে বলব কি ? কথাটা ফাঁস হয়ে যায় যদি ?"

বুড়ির বড়ই কৌতূহল হইল, বলিল—"মারে বলবি তা ফাঁস হয়ে যাবে ? তুই আর মুই কি তফাৎ নাকি ? খোদা খোদা ! অমন অবিশ্বাস করতে নেই।"

ছেলেরও কথাটা পেটের মধ্যে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না, সে বলিল—"তবে শোন্ কাউকে যেন বলিসনে, বিবিজিকে চুরি করে আনতে হবে।"

বুড়ি। "বিবিজি ? কোন বিবিজি ?

ছেলে। "মুন্না বিবিজি ?"

বুড়ি শূন্যজমীর উপর কল্পিত টাকার কাঁড়ি ঘৃণার ভাবে হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল—"হ্যাঁরে নেমক হারাম তুই অমন কাজ করবি ত তোর সাক্ষাতে গলায় ছুরি বসাব। মনে নেই কে তোকে দু দুবার বাঁচিয়েছে, কার অন্নের জোরে এখনো বেঁচে আছিস ? তার বোনকে তুই চুরি করে আনতে যাবি, আল্লা আল্লা।"

ছেলে বলিল—"সেই জন্যই তোকে বলতে চাইনি—

জানি বল্লেই গোল হবে। চিরকাল বসে খাবি সেটা বুঝ-ছিস নে? কত টাকা ভাব দেখি?"—

বুড়ি রাগিয়া বলিল—"অমন টাকার মুখে সাত ঝাঁটা।"

ছেলেরও মনে আগে হইতেই এক একবার কেমন অনুতাপের ভাব আসিতেছিল, মায়ের কথায় সে বুঝিল কাজটা সত্যই ভাল হয় নাই, বলিল—"কিন্তু এখন সব ঠিকঠাক, এখন পিছুই কি ক'রে—তাহলে নবাব সাহেব কি প্রাণ রাখবে?"

বুড়ি। "ঠিক ঠাক কি, সব খুলে বল দেখি"!

ছেলে তখন তাহাদের বন্দবস্তটা সব ভাঙ্গিয়া বলিল। বুড়ি শুনিয়া বলিল—"তার আর ভাবনা কি, তোর যেমন যাবার কথা আছে, তেমনি তাদের সঙ্গে চলে যাস, তাহলে ত আর কেউ তোকে সন্দেহ করবে না, আর আমি এখনি এ কথা বিবিজিকে গিয়ে বলি,—তারা সন্ধ্যা হতেই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। তাহলে কোনদিকেই আর গোল হবে না।"

বুড়ি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মুন্নাদের বাড়ী যাত্রা করিল।

সংসারে যাহাকে রাখ—সেই রাখে। জগতে তৃণ গাছটিও অবহেলার সামগ্রী নহে। দুস্তর তরঙ্গাকুল সমুদ্রে একটি তৃণও তোমাকে পথ দেখাইয়া তীরে লইয়া যাইতে পারে। এক দিন সেও তোমা হইতে উচ্চ। তাই বলি কাহাকে উপেক্ষা করিও না। মহম্মদ যখন বুড়ির উপ-

কার করিয়াছিলেন—তিনি কি জানিতেন এক দিন সেই সামান্য দীন হীন স্ত্রীলোক তাঁহার যে উপকার করিবে, জীবন দিয়াও তিনি তাহা শোধ করিতে পারিবেন না ?

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

এখন আর মসীনের বাড়ী দ্বারবান লোক নস্করের জমজমা নাই, ফটক তাই ভিতর হইতে সারাদিনই এক রকম বন্ধ থাকে, কেহ বাড়ী ঢুকিতে চাহিলে ডাকিয়া খোলাইতে হয়। বুড়ি দরজার কাছে আসিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেই ভোলানাথ নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। মহম্মদ গিয়া অবধি তিনি মুন্নার রক্ষকরূপে এই খানেই প্রায় থাকেন। স্নানাহার করিতে কেবল দু একবার বাটীতে যান।

বুড়ীকে ভোলানাথ চিনিতেন, সে মাঝে মাঝে মসীনের কাছে টাকা লইতে আসিত দেখিতে পাইতেন। আজ তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছে—বলিলেন—"বুড়ীজি বলিব কি—"

বুড়ী তাঁহার কথা শেষ করিতে দিল না, বলিল—"জি আমি একটা কথা বলিব, আগে শোন"।

বুড়ির স্বরে,বুড়ীর ধরণ ধারণে এমন একটা অস্বাভাবিক

গাম্ভীর্য্যের ভাব ব্যক্ত হইল—যে ভোলানাথের মনে ধাঁ করিয়া কেমন একটা খটকা উপস্থিত হইল, তিনি তাড়াতাড়ি হুড়কা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কথাটা কি?"

বুড়ি বলিল "আজ রাত্রে এই বাড়ীতে চুরি হইবে, সাবধান করিতে আসিয়াছি।"

ভোলানাথ। "চুরী! এখানে আর আছে কি যে চুরী করিতে আসিবে?

বুড়ী। "ধন কড়ির বাড়া রত্ন আছে—মুন্না বিবিজিকে চুরী করিতে আসিবে, জাহান খাঁর হুকুম।"

ভোলানাথ বিস্ফারিত চক্ষে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—"মহাভারত! তাও কি হয়?"

বুড়ি বলিল—"খোদা করুন, যেন না হয়। কিন্তু আমি মিথ্যা বলিতেছি না।"

ভোলানাথের হাত পা অবশ হইয়া আসিল, কপাল হইতে টস টস করিয়া ঘাম পড়িতে লাগি[illegible] তিনি বারান্দার একটা খুঁটি দুই হাতে ধরিয়া বলিলেন—"রাম রাম! এ কি ব্যাপার"।

বুড়ী বলিল—"জি অমন করিলে ত চলিবে না—একটা ত উপায় করা চাই।"

ভোলানাথ বলিলেন—"তাইত," বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া দরজার হুড়কাটা খুলিয়া বাহিরে এক পা বাড়াইয়া দিলেন। বুড়ি বলিল—"জি কর কি—কোথায় যাও?"

তাঁর এক পা চৌকাঠের এ পারে—এক পা ওপারে—তিনি বলিলেন--

"আমি লোক ঠিক করিতে যাই, দস্যুরা আসিলে ভাগাইয়া দিবে।"

বুড়ি বলিল—"তারা যে অনেক লোক অত লোক হাঁকান কি কম লোকের কাজ? আর এখনি অতলোকের যোগাড় করিয়া উঠা কি তোমার কর্ম্ম জি?"

ভোলানাথের যেন হুঁস হইল, বলিলেন. "তাইত, তাতে যে আবার পয়সা চাই, তা যে আমাদের নাই। তা বুড়ি জি—এই কথা শুনিলে লোকেরা কি অমনি মুন্না বিবিকে রক্ষা করিতে আসিবে না? এ দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া মানুষে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে?"

বুড়ীর অতি দুঃখে হাসি আসিল, বলিল "হ্যাঁ জি—এ সময় অমন ক্ষ্যাপার মত কথা বল কেন? খাঁজাহানের নাম শুনিলে কে এখানে প্রাণ খোয়াইতে আসিবে? আর যদি বা কেউ আসে—খাঁজাহানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমি কি জিতিবে জি? তাঁহার ইসারায় তোমার বাড়ী ঘর লোকজন যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।"

ভোলানাথ হতাশ হইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন—"তবে কি করিব, এখনি বিবিজিকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাই।"

বুড়ি বলিল—"এখনও এত রোসনাই, এখন যাওয়া

কেন? কেহ যদি দেখিয়া ফেলে ত সর্ব্বনাশ। আর একটু থাক, একটু গা ঢাকা ঢাকা হইলেই পলাইলে চলিবে—তারাও আসিবে সেই রাত দুপুরে। কিন্তু যাইবে কোথায়?”

ভোলানাথ একটু ভাবিয়া বলিলেন—“আমার বাড়ী গিয়া সকলে আজকের রাতটা লুকাইয়া থাকি, কাল সকালে এদেশ ছাড়িয়া যাইব, এদেশে আর থাকিতে আছে! ভগবান তোমার মনে এই ছিল!”

ভোলানাথের চোখে জল আসিল।

বুড়ি বলিল—“এ কথাটা ঠিক মনে লাগিতেছে না, বিবিজিকে এ বাড়ীতে না দেখিলেই আগে তোমার বাড়ীতে তাহারা খুঁজিতে যাইবে”।

ভোলানাথের কথা বাহির হইল না, বুড়ী বলিল—“জি যদি বল—আজ রাত্রে বিবিজিকে আমার বাড়ী লুকাইয়া রাখি, একথা আর কারো মনে আসিবে না।”

ভোলানাথ তাহাতেই রাজী হইলেন। আর কেহ হইলে এত সহজে এ প্রস্তাবে সম্মত হইত কি না জানি না। হাজার হউক, বুড়ী একজন অজানা অচেনা সামান্য লোক, দু একবার তাহাকে চোখে দেখিয়াছেন ছাড়া—তাহার আর বিশেষ তিনি কিছুই জানেন না। মুন্নার সহিতও যে বুড়ীর জানাশুনা আছে তাহাও নহে, মুন্নাকে সে কখনো চক্ষেও দেখে নাই, অথচ মুন্নার জন্য হঠাৎ তাহার

এত মাথা ব্যথা পড়িয়া গেল—যে মুন্নাকে যাচিয়া আশ্রয় দান করিতে আসিল, প্রকাশ হইলে জাহান খাঁর কিরূপ ক্রোধভাজন হইবে জানিয়া শুনিয়া তাহাও গ্রাহ্য করিল না, ইহাতে অন্য লোকের মনে নানা কথা উঠিতে পারিত, মুন্নাকে তাহার বাড়ী পাঠাইতে সম্মত হইবার আগে অন্ততঃ একবার অন্য কেহ ইতস্ততঃ করিত, কিন্তু ভোলানাথ স্বতন্ত্রদরের মানুষ, তিনি জানেন, যেখানে অত্যাচার সেই খানেই সহানুভূতি, যেখানে অন্যায় পীড়ন সেইখানেই সহৃদয়তা, ইহাতে আত্মপর পরিচিত অপরিচিত এ সকল আবার কি? এরূপ স্থলে তিনি যাহা করিতেন তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া জানেন, অন্যথা দেখিলেই তিনি আশ্চর্য্য জ্ঞান করেন। সুতরাং বুড়ীকে তাঁহার সন্দেহ মাত্র হইল না। তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি একটি কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল জলপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে বুড়ির দিকে চাহিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ করিলেন, বুড়ি যদি একটা তানপূরা হইত তাহা হইলে বরং তারগুলা ঝনঝন করিয়া দিয়া মনের এই কৃতজ্ঞতাটা সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেন। বুড়ি তাঁহার এই নূতন ধরণের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ বুঝিল কিনা কে জানে,—খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুদল।

ঝোপের অন্ধকার কায়ার উপর একটা ভীষণতর, গাঢ়তর অন্ধকার ছায়া ফেলিয়া, দ্বিপ্রহরের আগেই সশস্ত্র দস্যুদল একে একে মসীনের বাটীর প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পাপের একটা ভীম-করাল-মূর্ত্তি রজনীর প্রশান্তির হৃদয় মাড়াইয়া যেন বিকট নিঃশব্দ অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল, স্তব্ধ বনানী শিরায় শিরায় কাঁপিয়া উঠিল। সুষুপ্ত পাখীগুলি শিহরিয়া পাখনা ঝাড়া দিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, দুইটা শৃগাল ঝোপের একপাশ হইতে সচকিত দৃষ্টিতে দস্যুদের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে তাহাদের পাশ ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। দস্যুরা কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল অল্পক্ষণের মধ্যেই সিঁদকাটি দিয়া দেয়ালে মস্ত একটা গর্ত্ত করিয়া তুলিল, তাহার পর দুইজন করিয়া একসঙ্গে তাহার ভিতর দিয়া বাগানে প্রবেশ করিতে লাগিল। বাগানের শুকান পাতায় পা পড়িবামাত্র যখন মড় মড় শব্দ হইয়া উঠিল, অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ যখন মুক্ত আকাশের স্নিগ্ধ নক্ষত্রালোকে চারিদিক তাহাদের চোখে পড়িল, তখন একবার তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, একবার যেন তাহাদের গাটা ছমছম করিয়া উঠিল, সভয় দৃষ্টিতে একবার

ঐদিক ওদিকে চাহিয়া আবার নিঃশব্দ পদনিক্ষেপে দলপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইয়া বাটীর বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল; এখানে আসিয়া একজন বারান্দার থাম বাহিয়া উপরে উঠিয়া তাহার কোমর হইতে একগাছি রজ্জুর সিঁড়ি নীচে নামাইয়া দিল—তাহা বাহিয়া আর একজন উপরে উঠিয়া আসিল, তখন তাহারা দুই জনে দুই গাছা রজ্জুর সিঁড়ি ফেলিয়া আর দুই জনকে উঠাইয়া লইল, এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকে উপরে উঠিয়া আসিল, দুই চারিজন মাত্র নীচেই দাঁড়াইয়া রহিল। উপরে উঠা শেষ হইলে একজন তখন বারান্দার দক্ষিণ দিকের একটা ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, (এ সন্ধান ময়না বলিয়া দিয়াছিল।) ঘর অন্ধকার দেখিয়া অঙ্গাবরণ হইতে চকমকি সোলা ও পাকাটি বাহির করিয়া চটপট আলো জ্বালিয়া ফেলিল। বাহিরের অন্য সকলেই একে একে তখন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই আলোকে মশাল ধরাইয়া লইয়া, (প্রত্যেকের কোমরেই এক একটি মশাল ছিল) মুন্নাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্তব্ধ রাত্রে, শূন্য ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আলোক-হস্ত মানুষের ছায়াগুলা নৃত্য করিতে করিতে অন্য ঘরে সরিয়া যাইতে লাগিল, খাঁখাঁকারী শূন্যভবন প্রেতযোনীর যেন বিহারক্ষেত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল তবুও বাড়ীতে কাহাকেও পাওয়া গেল না, নিরাশ

হইয়া প্রহরীর কুটীল-বক্র-মুখরেখার খাঁজে খাঁজে অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল, অবশেষে সে বুঝিল "আর কিছু নহে, মুন্না পলাইয়াছে। পলাইবে আর কোথা? সেই পাজি নচ্ছার কাফের ভোলানাথটা আপন ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়াছে"। প্রহরী মনে মনে বদ্ধ-হুঙ্কার ছাড়িয়া ভাবিল "বেটা আমার হাত এড়াইবে তুমি"। সে তখনি লোকজন সঙ্গে লম্ফে লম্ফে বাড়ীর সিঁড়ি পার হইয়া বাগানে নামিল, সেখান হইতে দ্রুত পদে প্রাচীরের পর-পারে আসিয়া পড়িল। যাইবার সময় পাঁচ ছয় জন বলিষ্ঠ লোককে বাড়ীটা আরো খানিকক্ষণ ধরিয়া খুঁজিবার জন্য সেখানে রাখিয়া গেল।

প্রাচীরের বাহিরে ঝোপের মধ্যে ময়না দু চার জন দস্যুর সহিত তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—প্রহরী দস্যুদল লইয়া বাগানে প্রবেশ করিবার সময় ইহাদের এই খানেই বসাইয়া রাখিয়া যায়। তাহারা প্রবেশ করিবামাত্র ময়না মহা আগ্রহে তাহাদের দিকে চাহিল—কিন্তু প্রত্যেককে শূন্যহস্ত দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল—বলিল—"কি হইল কি?"

যখন শুনিল, 'মুন্না ওখানে নাই' তখন ঠোঁট কামড়াইয়া বলিল "ওকি কথা! কখনো ঘরের বার হয় না আজ সে নাই! কথা দেখিতেছি ফাঁস হইয়াছে—কোন বেটার কাজ—তাহাকে আজ আস্ত চিবাইব"—

অন্ধকারে ময়নার ক্রোধান্ধ মুখভঙ্গী দেখা গেল না, কিন্তু তাহার সেই বিকৃত গলার প্রত্যেক চিবান চাপাচাপা কথা নিঃস্তব্ধ ঝোপের মধ্যে যেন পিশাচী তালে নৃত্য করিয়া উঠিল। আলি হাড়ে হাড়ে কাঁপিয়া উঠিল। প্রহরীও তখন দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলিল—"যা করিব তাহা মনেই আছে, নখে করিয়া তাহাকে চিড়িব—কিন্তু এখন—" আলি নিজের সমস্ত শরীরে সত্যই নখ ও দাঁতের খরধার অনুভব করিতে লাগিল, সে আর পারিল না,—একটা গাছের ডাল জোরে ধরিয়া বলিল—"আল্লার কিরে—আমি এ কথা কিছুই বলিনি—"

আলি বেচারা—আর কখনো সে এরূপ কাজ করিতে আসে নাই—চিরকাল সে খাটিয়া খাইয়াছে, এ কাজে তাহার এই সবে হাতে খড়ি—কি করিলে কি হয় সে কিছুই জানে না, সুতরাং ভয়বিহ্বল হইয়া যেই এই কথা বলিয়া ফেলিল—অমনি প্রহরী বজ্রমুষ্টিতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল "নেমকহারাম তুইই বলেছিস ?"

আলি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল—বলিল—"আল্লার কিরে—আমি বলিনি—আমার মা বলেছে"—ময়না দাঁতে দাঁতে চিবাইয়া বলিল "বটে তোমার মা বলেছে! সে কোথা বল—নইলে এইখানে তোকে জবাই করিয়া যাইব" সে ভয়-কম্পিতস্বরে বলিল "আমাকে ছাড়িয়া দাও সব বলিতেছি হুজুর"—প্রহরী হাত ছাড়িয়া

দিল—সে বলিল "দোহাই, আমার দোষ নাই, মা তাহাকে বাড়ী নিয়া গিয়াছে"—

তখন তাহাকে শাস্তি দিবার সময় নয়, তাহা হইলে সময় বহিয়া যায়—শাস্তিটা ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখিয়া প্রহরী তাহাকে বলিল "চল্ তবে সেইখানে চল্"—মূহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তাহারা দ্রুতপদে বুড়ীর বাড়ীর দিকে চলিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

বুড়ি চলিয়া গেলে ভোলানাথ গৃহিনীকে ডাকিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। গৃহিনী মুন্নাকে সে সব কথা বলিতে অন্তঃপুর গমন করিলেন, ভোলানাথ [illegible] করিয়া একাকী বাহিরের একটি ঘরে বসিয়া রহিলে[illegible]., তিনি অকুল পাথার-ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। আগে হইলে হয়ত এরূপ কষ্টের অবস্থায় তানপূরাটাকে ধরিয়া বিলক্ষণ একবার নাড়াচাড়া দিয়া লইয়া একটু ঠাণ্ডা হইতেন, একটা কিছু উপায় আবিষ্ক্রিয়া করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু সে দিন আর নাই, মসীন গিয়া অবধি তাঁহার এ অভ্যাসটা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, সেই অবধি তানপূরার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক একরকম উঠিয়া গিয়াছে। মসীন

যাইবার পর একদিন ভোলাথাথ তানপূরা বাজাইতে গিয়া চোখের জল ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন এইরূপ একটা গুজব কেমন করিয়া গৃহিনীর কাণে যায়—সেই দিন হইতে মসীনের বাটীর তানপূরা আর তাঁহার নিজের তানপূরা দু দুইটা তানপূরা যে কোথায় লুকাইয়া গেল—কোনটাই আর ভোলানাথের চ'খে পড়ে না। অভ্যাস বশতঃ এক একবার যখন তাঁহার হাতটা ও মনটা তানপূরার জন্য বড়ই নিসপিশ করিয়া উঠে, তিনি অন্যমনস্ক ভাবে কখনো কখনো মসীনের মজলিস ঘরে আসিয়া দাঁড়ান, চারি দিকে একবার চাহিয়া দেখেন, যেখানে মসীন আসিয়া বসিতেন, যেখানে ভোলানাথ বসিয়া গান বাজনা করিতেন, গান বাদ্য হইয়া গেলে বাড়ী যাইবার সময় ভোলানাথ যেখানে তানপূরাটাকে রাখিয়া যাইতেন—সব দিকে একবার চাহিয়া দেখেন, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। এইখানেই তানপূরা খোঁজা তাঁহার শেষ হয়।

মসীন গিয়া অবধিইত ভোলানাথ মুষড়িয়া পড়িয়াছেন, তাহার উপর আজ আবার এই দারুণ বিপদ-আশঙ্কা। ভোলানাথ কষ্টে দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন—তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল "অসহায় নির্দ্দোষীর একি এ শাস্তি? দেবি মহামায়া? চিরকাল তোর করুণার উপর এক মনে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, চিরকাল জানি

তুই মা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, সে বিশ্বাস কি তুই আজ ভাঙ্গিবি মা? তোর অনাথ সন্তানের পানে মুখ তুলে চাহিবি নে মা"? ভোলানাথ করযোড়ে কম্পিতকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

"দয়াময়ী নামে তোর কলঙ্ক দিসনে শ্যামা,
নিরীহ নির্দ্দোষের পানে নয়ন তুলে বারেক চা মা,
অত্যাচারের পাষাণ পায়, দুর্ব্বলে প্রাণ হারায়
এ শঙ্কটে কেবা তারে, দয়াময়ীর দয়া বিনা।
চাগো মা করুণাময়ী নয়ন তুলে বারেক চা মা"

গাহিতে গাহিতে বেলা ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার মনের অন্ধকারে—চারিদিক অন্ধকার হইয়া পড়িল, তিনি সেই অন্ধকারে একাকী বসিয়া কেবলি গাহিতে লাগিলেন,"চাগো মা করুণাময়ী নয়ন তুলে বারেক চা মা!" চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল তিনি গাহিতে লাগিলেন—"নিরীহ নির্দ্দোষের পানে নয়ন তুলে বারেক চা মা।"

গৃহিনী কি কথা বলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি গান শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন,—যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন—ভুলিয়া গেলেন, সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের সঙ্গীত শুনিয়া তাঁহারও দুই চক্ষের জল রহিল না। খানিকক্ষণ পরে নয়নের জল সম্বরণ করিয়া গৃহিনী আস্তে আস্তে বলিলেন—"বিবিজি যে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন,"

ভোলানাথ তখন তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিনী বলিলেন তাহাকে তুমি বুড়ির বাড়ী লইয়া যাও—আমি ও মতি আমাদের বাড়ী চলিয়া যাই।”

* * * *

বুড়ির বাড়ী মুন্নাকে লুকাইয়া রাখিয়াও ভোলানাথের উৎকণ্ঠা দূর হইল না, কে জানে তাঁর কেমন মনে হইতে লাগিল—‘যদি দস্যুরা মুন্নাকে বাড়ীতে না পাইয়া আবার অন্য জায়গায় খুঁজিতে যায়,—আর যদিই বা তখন তাহারা কোন প্রকারে বুড়ির বাড়ী আসিয়া পড়ে? এ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার একটা উপায় মনে হইল। তিনি মুন্নাকে বুড়ীর বাড়ী রাখিয়া আবার মসীনের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বাগানের একটি ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন,—ভাবিলেন “এখানে বসিয়া, দস্যুরা কখন আসিবে—যাইবে সব তিনি দেখিতে পাইবেন, সুতরাং তাহাদিগকে এ বাড়ী খুঁজিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ বুড়ীর বাড়ী গিয়া মুন্নাকে লইয়া আসিতে পারিবেন—তাহা হইলে বুড়ীর বাড়ী হইতে মুন্নাকে লইয়া যাইবার ভয়ও আর রহিল না,—তারপর রাতটা এক রকমে কাটাইতে পারিলে সকলে মিলিয়া এখানকার পায়ে নমস্কার করিয়া, অন্যত্রে চলিয়া যাইবেন।

রাত্র গভীর হইলে দস্যুরা বাগানে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার চোখের উপর দিয়া উপরে উঠিয়া গেল, তাঁহার সর্ব্ব শরীরে রক্ত রাশি বেগে বহিয়া উঠিল, তিনি একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবার চক্ষু-মুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ পরে তাহাদিগকে যখন বাগান পার হইয়া চলিয়া যাইতে দেখিলেন—তখন তাঁহার উত্তেজিত শিরারাশি শিথিল হইয়া পড়িল, তিনি সবলে একটা গভীর রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া—দৃঢ়ভাবে সেইখানে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আরো কিছুক্ষণ গেল—যখন আর কাহারো সাড়া শব্দ দেখিলেন না,—যখন ভাবিলেন সকলে চলিয়া গেছে—তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঝোপের বাহিরে আসিলেন। কিন্তু কিছু দূর না যাইতেই দুই চারি জন লোকের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সকলেই এক সঙ্গে চাপাস্বরে বলিয়া উঠিল—"কোন হ্যায়রে—পাকড় লেরে· পাকড় লে" বলিতে বলিতে তাঁহাকে সকলে ঘেরিয়া ফেলিল, কিন্তু যখন দেখিল—তিনি পুরুষ মানুষ, তখন হতাশ হইয়া তাঁহার পিঠে দুই চারিটা গুঁতা বসাইয়া বলিল—"ঔরৎকে কোথায় রেখেছিস ?"

হঠাৎ বন্দী হইয়া ভোলানাথ প্রথমটা নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, তাহার পর বলিলেন—"কি করেছি তোদের বাবা ? আমাকে কেন" ?

তাহারা বলিল—"চুপ র কাফের, ঔরৎ কোথা" ?

ভোলানাথ বলিলেন "রাম রাম ও কথা বলে,—তা তোমরা ত সব খুঁজিলে বাবা—আমি কি বলিব"—

আবার দুচারিটা হাতের ধাক্কা তাঁহার পিঠে পড়িল—তিনি পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন,—দস্যুরা তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে নানা রূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিতে করিতে দড়ী দিয়া তাঁহার হাত বাঁধিতে আরম্ভ করিল। ভোথানাথ বলিলেন, "বাঁধ কেন? কোথায় লইয়া যাবে চল যাই-তেছি।" তাহারা বিকৃত স্বরে তাঁহাকে ভেংচাইয়া তাঁহার মুখের উপর একখানা কাপড় আঁটিয়া দিল। তাহার পর তাঁহার হাতের বাঁধা দড়ি ধরিয়া—খিড়কির দ্বার দিয়া হিড় হিড় করিয়া ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

নিভৃত নিঃস্তব্ধ কুটীরের ক্ষীণ দীপালোক একটা বিষাদ-পূর্ণ আশঙ্কার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—অজ্ঞাত অদৃশ্য একটা বিভীষিকা, আপনার নিঃশব্দগর্জ্জিত নিশ্বাস প্রশ্বাস শব্দে কুটীরের ঘোর স্তব্ধতাকে যেন স্তব্ধ করিয়া দিয়া মুন্নার চক্ষে মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মুন্না দিব্য-দৃষ্টি পাইয়াছে; মুন্না দেখিতেছে, সেই করালমূর্ত্তির অন্ধ-

কার-হস্তে তীক্ষ্ণ-শাণিত-কৃপাণ মুহুর্মুহু দুলিতেছে, মুহুর্মুহু মুন্নার বক্ষের প্রতি উন্মুখ হইয়া ঝুঁকিতেছে, বুঝি এই আসে আসে, বুঝি এই পড়ে পড়ে, বুঝি এই মুন্নার বুকে বিঁধে বিঁধে। মুন্না সেই ভীম তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ প্রতিক্ষণে যেন বক্ষে অনুভব করিতেছে। মুন্নার চক্ষে পলক নাই, হৃদয়ে শোণিত বহিতেছে না, মুন্না অজ্ঞান পাষাণ-মূর্তির মত সেই অন্ধকার আশঙ্কার দিকে চাহিয়া আছে।

যাহা অন্ধকার যাহা অদৃশ্য,—তাহার উপর বল প্রয়োগ চলে না, তাহার সহিত যুদ্ধ করা যায় না; তাই তাহা সর্ব্বগ্রাসী, অনন্ত—আর এই জন্যই তাহা এত ভয়ানক; শত সহস্র নিশ্চিৎ বিপদের মধ্যে যে হৃদয় অটল ভাবে চলিয়া যায়—সে হৃদয়ও এই অনির্দ্দেশ্য ভয়ের নিকট তাই কম্পমান।

মুন্নার সেই পীড়িত ক্লিষ্ট অবসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া অচেতন দীপ শিখাও যেন আকুল হইয়া উঠিয়াছে. সে যে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন তাহার হৃদয়ের মর্ম্মভেদী এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস।

বুড়ির মুখে কথা সরিতেছে না, এক একবার কথা কহিতে গিয়া সে কেবল হায় হায় করিয়া উঠিতেছে, সেই স্তব্ধ গৃহে সে হায় হায় এমন ভীষণভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে যে আপনার স্বরে চমকিয়া উঠিয়া বুড়ি আপনি নিঃস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে।

সহসা বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল, দ্বারে আঘাত পড়িল—আলি ডাকিয়া বলিল—"মা দরজা খোল"

বুড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল—সে ভাবিল আলি কাজ সারিয়া একাকী ঘরে ফিরিয়া আসিল। খুলিতে না খুলিতে হুড় মুড় করিয়া দস্যুদল গৃহে প্রবেশ করিল—মুন্না এতক্ষণ যে তরবারির অগ্রভাগ হৃদয়ে অনুভব করিতেছিল, সবলে আমূল তাহা যেন তাহার বক্ষে কে বিঁধিয়া দিল, তাহাদের দেখিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া ধীরে ধীরে ভূমে লুটাইয়া পড়িল।

দস্যুরা ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল, ময়না প্রদীপটা উসকাইয়া দিয়া এক হাতে তাহা মুন্নার মুখের কাছে ধরিল,—আর এক হাতে মুন্নার মুখাবরণ খুলিয়া দিয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ এই রে, তুলে নে" কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না, দীপালোকে সেই নির্জীব দেবীমূর্ত্তি যখন স্পষ্টরূপে দস্যুদের চক্ষে পড়িল, তখন সেই পাষণ্ড নির্দ্দয় হৃদয়েরাও বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, ময়না আবার বলিল "আর দেরী কেন?" প্রহরী তখন কম্পিত পদে অগ্রসর হইল, কম্পিত হস্তে তাহাকে ভূমি হইতে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া দ্রুত পদ নিক্ষেপে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে গমন করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অটল।

ভোলানাথকে নবাববাটীতে আনিয়া ফেলিয়া দস্যুগণ তাঁহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল, এবং আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে নবাবের নিকট সমস্ত সংবাদ কহিতে প্রেরণ করিল। কিছু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া ভোলানাথকে নবাবের কাছে লইয়া গেল। এখানে আসিয়াই ভোলানাথ বলিলেন—"বন্দিগি হুজুর, ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা হোক্, বেটারা জোর করিয়া আনিয়াছে।"

নবাবের চক্ষু প্রদীপ্ত, মুখ আরক্তিম, আমস্তক ঈষৎ কম্পমান, যেন একটা রুদ্ধ প্রবাহ মহাবেগে তাঁহার সর্ব্বশরীর তরঙ্গিত করিতেছে। তিনি বলিলেন—"তুমি আপনার পায় আপনি বেড়ী দিয়াছ—ইচ্ছা করিলে তুমিই খুলিয়া লইতে পার।"

ভোলানাথ দেখিলেন—বেগতিক, হাত রগড়াইতে স্বরু করিলেন।

নবাব বলিলেন—"কোথায় রাখিয়াছ বল, এখনি মুক্তি দিতেছি।"

ভোলানাথ মনে মনে বলিলেন—"তবে দেখিতেছি আর মুক্তি হইল না।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"হুজুর আর যাহা হয় জিজ্ঞাসা করুন, ও কথাটা বলিতে পারিব না।"

জাহান খাঁ বসিয়াছিলেন, উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "বলিতে পারিবে না? জান কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ?"

ভোলানাথ গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন "হুজুর—দুই জনেই একজনের সম্মুখে।"

নবাবের প্রদীপ্ত চক্ষু দিয়া স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল—তিনি বলিলেন—"না বলিলে কি হইবে জান?"

ভোলানাথ আবার হাত রগড়াইতে লাগিলেন।

নবাব একজন দস্যুর দিকে চাহিলেন, সে তাহার তরবারি কোষ-মুক্ত করিয়া ভোলানাথের মাথার কাছে উচ্চ করিয়া ধরিল—নবাব বলিলেন—"চাহিয়া দেখ।"

ভোলানাথ একটু হাসিলেন, বলিলেন—"যাঁহার ইচ্ছায় সংসার চলিতেছে—তাঁহার হাতেই জন্ম মৃত্যু, আমার ঐরূপ মৃত্যুই যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়—তবে সে ইচ্ছার অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য পালন করিয়া মরিতে আমার দুঃখ নাই।"

জাহান খাঁর আরক্তিম মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তিনি কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, অবনত মুখে বৃহৎ কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই একবার পদশ্চারণ করিয়া আবার ভোলানাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবার অনুনয়ের স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভোলানাথ আমার শত্রুতা সাধিও না—তুমি

আমার সহায় হও, আমাকে চিরকালের জন্য ঋণে বদ্ধ কর—নবাব জাহান খাঁ আজ তোমার হাতে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিতেছে———”

ভোলানাথ রাম রাম বলিয়া হাত টানিয়া লইলেন, বলিলেন—“নবাব শা, ওকথা বলিবেন না—পুরস্কারের লোভ দেখাইবেন না, উহা অপেক্ষা শাস্তির কথা বলুন।”

নবাব শা প্রত্যাহত হইয়া তীব্র গতিতে পিছন হঠিয়া দাঁড়াইলেন—রোষ কম্পিত স্বরে বলিলেন—“সময় দিতেছি এখনো বুঝিয়া দেখ।”

ভোলা। “হুজুর যখন জন্মিয়াছি—একদিন মরিতেই হইবে, বিছানায় শুইয়া রোগে মরিতাম—না হয় আপনার হাতেই মরিলাম”।

রুদ্ধউৎস এইবার ছুটিয়া গেল—নবাবশার আর ধৈর্য্য রহিল না, তাঁহার সমস্ত আশা ভরষা একটা সামান্য কেশ-স্পর্শে যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—তিনি তাই জ্ঞানহীন, তিনি তাই উন্মত্ত। তিনি আগেই এতদূর আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন যে এখন পশ্চাতে রাশ টানিতে আর তাঁহার সাধ্য নাই। যে মুহূর্ত্তে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর সমস্তই ক্ষুদ্র এক ‘আমার’ বিরোধী বলিয়া সমস্তকেই শত্রু মনে হয়—জাহানখাঁর সেই মুহূর্ত্ত; যে মুহূর্ত্তে অমৃতকে বিষ বলিয়া মনে হয়,—দয়া করুণা—ন্যায়—বিবেক—সকলি যে মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী হৃদয়ের কাছে পেষিত হয়—খাঁজাহানের সেই মুহূর্ত্ত;

তিনি ইঙ্গিত করিলেন—অমনি ভোলানাথের দুই দিকে দুই খানা তরবার ঝকঝক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভোলানাথ তাহার মধ্যে নির্ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া দিলেন—মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার বলিলেন—"আপনি যাহা লইতে পারেন তাহা লউন—কিন্তু যাহা আমার হাতে তাহা পাইবেন না।"

ভোলানাথের অমানুষিক সাহসে নবাবশা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—তাঁহার সেই দারুণ মুহূর্ত্ত হঠাৎ যেন চলিয়া গেল—কি মনে হইল কে জানে, বলিলেন—"না মারিও না—বন্দী করিয়া রাখ—"

দস্যুরা ভোলানাথকে লইয়া চলিয়া গেল—কিছু পরেই মাদারী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"হুজুর, হুকুম তামিল, নওয়া বেগম হাজির।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সরাইয়ে।

সিন্ধুদেশে অনেক গুলি মুসলমান তীর্থ আছে। সে জন্য দেশ বিদেশ হইতে এখানে মুসলমান যাত্রী সমাগত হইয়া থাকে। মগরপীর (বা মঙ্গোপীর) দক্ষিণ সিন্ধুর একটি তীর্থ-স্থান।

"মগরপীর করাচীর তিন ক্রোশ উত্তরে স্থিত একটি উপত্যকা ভূমি। এখানে কুঞ্জবন পরিবৃত একটি মন্দির ও মন্দিরের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বিত এক উষ্ণ জলাশয়— তাহাতে বড় বড় কুম্ভীর (মগর) কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগ্ন। খর্জ্জুর বন বিনিঃসৃত গন্ধকাক্ত উষ্ণ প্রস্রবন হইতে ঐ জলাশয়ের উৎপত্তি ও উহাতে স্নান মহোপকারী বলিয়া গণিত।*

মুসলমানদিগের নিকট এ তীর্থের বিশেষ মাহাত্ম্য। "কারণ, প্রবাদ এই, একজন পীর একটি ফুলকে কুমীর বানাইয়া দেন—তাহার বংশজেরা এই জলাশয়ে বাস করিতেছে"। "কাহারো কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সে মগর পীরে গিয়া ছাগাদি উপহার দানে কুম্ভীর রাজের পরিতোষ সাধন করে।"

আজ সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে একখানি সাগর গামী মস্থলা-ক্ষুদ্র জাহাজ মুসলমান যাত্রীদল লইয়া করাচী পৌঁছিল। সন্ধ্যা দেখিয়া যাত্রীদল সে রাত্রে নৌকাতেই থাকিতে মনস্থ করিল, তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র কেবল তখনি তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। পাঠকগণ বুঝিয়াছেন ইনি মহম্মদ মসীন।

প্রায় ৪ মাস হইল মসীন নৌকা যাত্রা করিয়াছেন, যাত্রা করিয়া অবধি এমন একদিনও যায় নাই—যে দিন লক্ষ্য

---

* ১২৯৩ সালের ৪র্থ সংখ্যক ভারতীতে সিন্ধু কাহিনী দেখ।

স্থানে পৌঁছিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েন নাই, নৌকা যতই অগ্রসর হইয়াছে, যাত্রা শেষ করিবার জন্য তিনি ততই অধিক ব্যাকুল হইয়াছেন।

মহম্মদের এই যে আকুলতা ইহা যাত্রীর কাম্য-কামনা লাভের আকুলতা নহে, ইহা পুত্রের পিতৃ দর্শন-লালসা, ইহা প্রিয় জনের প্রিয়জন লাভের প্রাণগত ইচ্ছা, ইহার নিকট দিন রাত্র, সুবিধা অসুবিধা নাই।

নৌকা লাগিবা মাত্র তিনি কম্পিত হৃদয়ে কূলে নামিলেন। সিন্ধু তখন ইংরাজের নহে—মীরের রাজ্যে তিনি পদার্পণ করিলেন। কত দিনের পর, কত ঔৎসুক্যের পর করাচীর মাটীতে তাঁহার পা পড়িল। কিন্তু পিতা কোথায়? এখানে তিনি কোথায় আছেন—সে সন্ধান এখন কেমন করিয়া পাইবেন? যতক্ষণ নৌকায় ছিলেন—ততক্ষণ কেবল করাচী পৌঁছিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এখানে পৌঁছিয়াও যে সহজে পিতৃ দর্শন না হইতে পারে এ কথা তখন মনেই আসে নাই। তীরে পৌঁছিয়া চারিদিকে আকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—যখন দেখিলেন চারিদিকের অপরিচিত দৃশ্যের মধ্যে তিনি নিতান্তই একাকী, তখন সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্ত কাল নিশ্চল ভাবে সমুদ্র-মুখী হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শীতকাল, সমুদ্রের সে ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন, শত সহস্র মহাতরঙ্গের অনবরত সফেন আস্ফালন নাই।

মনোরা খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী দ্বীপ বক্ষে সুনীল বিরাট সমুদ্র প্রশান্ত ভাবে বিরাজিত। সেই গম্ভীর সমুদ্রের প্রশান্ত হিল্লোলের উপর—উপকূলের, তক্ তকে জমাট বালির উপর, সেই বালি নির্ম্মিত কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ ছোট ছোট পাহাড় গুলির উপর জ্যোৎস্নালোক তরঙ্গিত হইতেছে। মাঝে মাঝে সজোরে কনকণে শীতের বাতাস বহিতেছে—শুভ্র জ্যোৎস্না সহসা যেন তাহাতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তীরাহত তরঙ্গের কুলুকুলু শব্দ যেন সে বাতাসের শব্দের সহিত মিশাইয়া যাইতেছে!

তীরে লোক জন প্রায় নাই—দু একজন ধীবর মসীনের নিকট দিয়া তাঁহার অপরিচিত মূর্ত্তির দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেল—এক জন তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—যেন কথা কহিবার অভিপ্রায়; কিন্তু মসীন আগেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি যাত্রী, সরাই খুঁজিতেছি—নিকটে সরাই আছে কি?"

মসীন হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—সে ভাষা সে জানে না, তিনি তখন ফার্সিতে বলিলেন—তাহাও সে বুঝিল না। এই সময় একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রমূর্ত্তি সিন্ধি তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, ধীবর সিন্ধি ভাষায় তাহাকে কি বলায়, সে ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া মসীনকে ফার্সিতে জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কি চাহেন?" মসীন পূর্ব্বের প্রশ্ন করিলেন,

সে উত্তর করিল "সরাই বেশী দূর নহে। চলুন আমি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি।"

মসীন তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। সমুদ্রের গম্ভীর প্রশান্ত দৃশ্য পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাঁহারা সরাই অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তখনকার করাচী ইংরাজের আমলের এ করাচী সহর নহে। তখন সমুদ্র তীরে বন্দর ছিলনা—তীরে থাকিবার মধ্যে কেবল ধীবরদিগের কয়েক খানি কুটীর ছিল মাত্র। করাচীর অন্তরেও যে বেশী বাড়ীঘর ছিল—তাহাও নহে। অধিকাংশই পর্ণ কুটীর, মাঝে মাঝে সমৃদ্ধিসম্পন্নদিগের দুই চারিটি একতালা বাড়ী। স্থানে স্থানে মসজিদ দেবালয় দেখা যাইতেছিল বটে—কিন্তু তাহাও সুবৃহৎ সুদৃশ্য নহে। এখানে গাছ পালাও বেশী নাই—দূরে দূরে কোথাও এক একটি গাছ শুভ্রজ্যোৎস্নার মাঝ-খানে স্তম্ভিত ছায়ায় ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে একটি দোকান গৃহের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন, এই দোকানের লাগাও আর একখানি ঘর—তাহাই যাত্রীদিগের সরাই। কথোপকথনের অধিকাংশই সিদ্ধির প্রশ্ন, মহম্মদেরউত্তর। তিনি কেবল তাহাকে একবার প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি বলিতে পারেন মতাহার আগা নামে একজন যাত্রী এখানে আসিয়াছেন কি না?" সিদ্ধি বলিল 'না বলিতে পারিলাম

না। যদি আসিয়া থাকেন সরাইয়ে সন্ধান পাইতে পারিবেন" ?

মসীনও ঐ আশাতেই সরাই গমন করিতেছিলেন। সিদ্ধি তাঁহাকে সরাই দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে অনেক গুলি যাত্রী,—মসীন প্রতি জনের মুখের দিকে আগ্রহ-দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন—প্রতি জনকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—মতাহার আগা বলিয়া এখানে কোন যাত্রী আসিয়াছেন কি ?" যাত্রীগণ তাঁহার ব্যবহারে অবাক হইয়া গেল, সকলেই কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, কেহ নিস্তব্ধে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ রূঢ় স্বরে অপরিচিত ভাষায় বিড় বিড় করিয়া উঠিল, কেহ আস্তে আস্তে হিন্দিতে বলিল "না মতাহার আগা কেহ এখানে নাই"। অবশেষে একজন যাত্রী বলিল-"মতাহা আগা! যখন মগর পীরে যাই যেন ঐ নামের এক লোককে সেখানে দেখিয়াছিলাম"—

একটা অব্যক্ত আনন্দে মসীনের হৃদয় পূর্ণ হইল—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার পর ?" উত্তর হইল "তারপর আমরা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তাঁহারা মক্কার যাত্রী যত জন ছিলেন তাঁহারা সেইখানেই রহিলেন, ইহার বেশী আর কিছুই জানি না।"

মসীন বলিলেন "সে আজ কত দিন ?"

"সাত আট দিন হইবে"

"মগর পীর এখান হইতে কত দূর ?"

"তিন ক্রোশ"

"পথ দেখাইয়া আজই আমাকে কেহ সেখানে লইয়া যাইতে পারে ?"

"জানি না। আমরা দিনের বেলা গিয়াছিলাম। আমাদের যে সেথো ছিল—তার বাড়ী নিকটে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার"

যাত্রী সরাই দ্বারে আসিয়া অঙ্গুলী দিয়া সেথোর বাড়ী দেখাইয়া দিল—মহম্মদ সেই দিকে ধাবিত হইলেন। তাহার বাড়ীতে আসিয়া তাহার পুত্রের কাছে শুনিলেন যে সে বাড়ী নাই যাত্রী লইয়া কোথায় গিয়াছে। মসীন বড় আশায় নিরাশ হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য আর কাহাকেও এখন পাওয়া যাইবে কি না।"

পুত্র বলিল "আজ রাতে লোক মিলিবার আশা নাই, দিনে ঢের পাওয়া যাইবে"

মহম্মদ বলিলেন "মগর পীরের রাস্তা কোন দিকে ? আমাকে ভাল করিয়া চিনাইয়া বল" সে তাঁহার সঙ্কল্প বুঝিল, যতদূর পারিল ঠিকানা বুঝাইয়া দিয়া বলিল "যাইতে পার যাও, কিন্তু আমার মনে লইতেছে রাতটা থাকিলেই ভাল ছিল। বিশেষ যে শীত, পথ না চিনিতে পারিলে এই শীতে ঘুরিতে হইবে।"

বলিয়া সে দ্বার বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিল, মসীন তন্নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিলেন। মনে করিলেন রাত্রে যদিও মগরপীরে না পোঁছিতে পারেন অন্ততঃ তাহার এতটা নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন যে প্রাতঃকালেই সেখানে পোঁছিতে পারিবেন।

শুষ্ক-শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তর পথ। মাঝে মাঝে দৈবাৎ এক একটা ছোট কাঁটার গাছ—আর শুষ্ক তৃণ-গুচ্ছ ছাড়া ত্রিসীমায় আর গাছ পালা নাই, শষ্যক্ষেত্র নাই,—লোক লোকালয় নাই—কঙ্কর পাথর পূর্ণ বালুকাময় উচ্চ নীচ ভূমি—স্তব্ধ কঠিন সমুদ্রের মত কেবল ধূ ধূ করিতেছে। দূরে দিগন্তে ছোট ছোট উলঙ্গ পাহাড় শ্রেণী—সারি গাঁথিয়া আকাশের মেঘের মত দাঁড়াইয়া আছে; উপরে চাঁদ ভাসিতেছে, অল্প অল্প ধূলা উড়াইয়া শুভ্রজ্যোৎস্না ম্লান করিয়া কণকণে বাতাস বহিতেছে,—পথিক একাকী এই জন শূন্য প্রান্তর পথে দ্রুত গতিতে চলিয়া এহেন দারুণ শীত রাত্রেও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিয়াছেন—তথাপি প্রান্তর ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। গভীর রাত্রে স্তব্ধ প্রান্তরে হঠাৎ ঘণ্টার শব্দ উত্থিত হইল, অল্পক্ষণের মধ্যে এক দল উষ্ট্র মহম্মদের নেত্র গোচর হইল। তিনি নিকটে আসিয়া একজন বাহক-কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মগরপীর আর কতদুর?" উষ্ট্র-বাহক হাসিল, বলিল—"আজ যাইবি নাকিরে? বাউরা বাউরা! নিকটে একটা সরাই আছে আজ সেই খানে যা,

মগরপীরে আজ পৌঁছিতে পারিবিনে”—বলিতে বলিতে উষ্ট্র বাহক দূরে গিয়া পড়িল—মহম্মদ আবার চলিতে লাগিলেন—খানিক দূর গিয়াই পথের বাম পার্শ্বে সত্যই একটি সরাই দেখিতে পাইলেন।

মহম্মদ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরাই-রক্ষক শীতকালের দিনে সরাই-সংলগ্ন তাহার ক্ষুদ্র গৃহ-দ্বার বন্ধ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ ঘন ঘন দ্বারে আঘাত হওয়াতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে বুঝিল নূতন যাত্রী আসিয়াছে। না উঠিয়াই সে মহা চীৎকারে তাহার মুণ্ডপাতে প্রবৃত্ত হইল। মহম্মদের এক কথায় সে চীৎকার হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল, দ্বার অর্গল মুক্ত হইল—রক্ষক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—মহম্মদ তাহার হাতে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া বলিলেন—“মগরপীর এখান হইতে আর কতদূর বলিতে পার?”—

আর তাহার অসন্তুষ্টির কারণ নাই, সে বিনীত ভাবে বলিল—“এখনো অনেক দূর—আপনি এক ক্রোশ মাত্র আসিয়াছেন—এখনো দুই ক্রোশ যাইতে হইবে।” এতক্ষণে এক্ক্রোশ মাত্র আসিয়াছেন মহম্মদ আশ্চর্য্য হইলেন—“বলিলেন—এখন ছাড়িলে কখন গিয়া পঁহুছিব” ? রক্ষক বলিল “ঠিক পথ ধরিলে সকালেই পৌঁছিতে পারিবেন।” মহম্মদ বলিলেন—“কোনটি ঠিক পথ?”

সে বলিল—“এখান হইতে যাইবার সময় পশ্চিমের

শেষ রাস্তাটিই মগরপীরের রাস্তা, কিন্তু পরে আবার অনেক ঘোরফের রাস্তা আছে, যদি ভুল রাস্তা ধরেন পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে—রাতটা কি থাকিয়া গেলে হয় না? কাল আমি লোক দিতে পারি।”

মহম্মদ বলিলেন—“তুমি আজই সঙ্গে যাইতে পার না?”—সে বলিল “হুজুর—আপনার সঙ্গে যাইব—সেত আমার ভাগ্য। কিন্তু সরাই ফেলিয়া যাইতেছি—যদি আমার উপরওয়ালা টের পায় ত কর্ম্মটি যাইবে।”

মহম্মদ সে রাত্রে অগত্যা সরাইয়ে বাস করিতেই সঙ্কল্প করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন “সরাইয়ে কত লোক আছে?”

উত্তর হইল—“সরাই সবই প্রায় খালি, একজন লোক আছে মাত্র। আমি থাকিতে আপনার কোনই অসুবিধা হইবে না”।—

সরাই-রক্ষক সরাইয়ের দরমার বেড়া দেও া একটি কুঠরীতে দীপ জ্বালাইয়া দিয়া মহা যত্নসহকারে .হাকে কিছু আহার্য্য ও পানীয় আনিয়া দিল, মহম্মদ সেই আতিথ্যের বিনিময়ে তাহাকে বিশেষরূপ সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। সে চলিয়া গেল—মহম্মদ শয়ন করিলেন। শুইবার সময় দ্বার বন্ধ করিলেন, কিন্তু দরমার দ্বার ভাল করিয়া বন্ধ হইল না, তাহার ফাঁক দিয়া নীলাকাশ খণ্ডের উপর চন্দ্র দেখা যাইতে লাগিল,—তিনি সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুন্নার নির্ম্মল হৃদয়ের বিষন্নতা চন্দ্রের সেই কলঙ্কের মত তাঁহার

মনে হইতে লাগিল, বিষণ্ণতাই তাহাকে যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছে। চাঁদের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীর কথা মহম্মদের মনে পড়িয়া গেল—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহম্মদ বলিলেন—"জগৎ প্রহেলিকা, জগতে পাপের পরিণাম পুণ্য, দুঃখের পরিণাম শান্তি, সত্যং শিবং সুন্দরং এই দুঃখময় জগতের অন্তরে নিহিত, দুঃখের প্রতি কিসের তবে আতঙ্ক?" চাঁদের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে শান্তিতে তাঁহার হৃদয় ডুবিয়া গেল—চাঁদের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ মহম্মদ চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন—সেই বিজনগৃহে কে যেন তাঁহাকে 'উঠ' বলিয়া ডাকিল। তিনি উঠিয়া বসিয়া চকিত দৃষ্টিতে গৃহের চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন—কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল সেই 'উঠ' শব্দের শেষতান কক্ষের চারিদিক হইতে রিরি করিয়া তাঁহার কাণে এখনো যেন বাজিতে লাগিল। তিনি উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন, কি জানি যদি বাহির হইতেই কেহ ডাকিয়া থাকে। বাহিরেও কাহাকে দেখিলেন না—কিন্তু সহসা রুগ্নকণ্ঠের মৃদু কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে শুনিবার জন্য তিনি কান পাতিলেন—আর শুনিতে পাইলেন না—শব্দ মৃদুতম হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। মহম্মদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—এই বিজন প্রদেশে এ কোন রোগীর কাতর কণ্ঠস্বর?

তাঁহার মনে পড়িল, তিনি যে ঘরে শুইয়াছিলেন—সেই ঘরের দরজার বেড়ার পাশে আর একজন যাত্রী আছে। ইহা তাহারি কণ্ঠস্বর ভাবিয়া মহম্মদ সেই কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইবা মাত্র আবার মৃদু কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—তিনি আস্তে আস্তে দ্বারে হাত দিলেন—দ্বার খুলিয়া গেল—গৃহ মধ্যে একজন শয়ান দেখিতে পাইলেন, শায়িত ব্যক্তি এই সময় পাশ ফিরিয়া কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—"আঃ মুন্নারে—" মহম্মদ চমকিয়া উঠিলেন, আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন, রোগীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—কক্ষের কোণে রক্ষিত একটি ক্ষুদ্র দীপের ক্ষীণালোক রোগীর মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল—মহম্মদ জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু মতাহারকে চিনিতে পারিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

মতাহার আর কতদিন কন্যাকে না দেখিয়া থাকিবেন, মক্কা হইতে বাড়ী অভিমুখে ফিরিয়া অল্প দিন মাত্র এখানে আসিয়াছেন, করাচীর তীর্থদর্শন করিয়া বাড়ী যাত্রা করিবেন। কিন্তু মানুষের সাধ, বিধির বাদ। মগরপীর দেখিয়া যে রাত্রে এই পান্থশালায় আসিয়াছেন, সেই রাত্রে

হইতেই তিনি পীড়াক্রান্ত। সঙ্গে যে সকল সাথী ছিল—তাহারা দুই এক দিন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিল, কিন্তু তাহার পর অন্য তীর্থে চলিয়া গেল, তাহারা তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়াছে, রোগীর কাছে অধিক দিন বসিয়া থাকিতে তাহাদের সময় নাই! সহায়হীন সঙ্গীহীন মতাহার এই বিজন প্রান্তরে একাকী পড়িয়া রহিলেন। এথানে বন্ধুর মধ্যে সহায়ের মধ্যে এক সরাই রক্ষক। সাধ্য মত সে যত্নের ত্রুটি করে না, তাহার বৃদ্ধা মা প্রায় সারা দিনই তাঁহার সেবাশুশ্রষা করে, রাত্রেও তাঁহাকে ছাড়িয়া যায় না; পুত্র মাঝে মাঝে আসিয়া থবর লয়, তাঁহার অল্প স্বল্প যা আবশ্যকীয় দ্রব্য তাহাও (অবশ্য দ্বিগুণ দরে) যোগাইয়া দেয়, ইহা ছাড়া আরও একটি কাজ করে—টোটকা টাটকা যত রকম ঔষধ তাহার জানা আছে তাহাও তাঁহার উপরে অসঙ্কোচে চালায়। কিন্তু পীড়া কঠিন, গুরুতর জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নানা উপসর্গ, সরাই রক্ষকের ডাক্তারিতে কিছুই হইতেছে না, সেই যে মতাহার বিছানায় পড়িয়াছেন কয়েক দিনের মধ্যে একটু সুস্থির হইতে পারেন নাই, ক্রমাগত ছটফট করিয়াছেন। আজ সন্ধ্যা হইতে কেবল সেরূপ ছটফটানি নাই, জ্বর অনেক নরম, উপসর্গও ঘুচিয়াছে, একটি মাত্র কুলক্ষণ তৃষ্ণা কিছুমাত্র কমে নাই। কতদিন পরে আজ সন্ধ্যা হইতে তাঁহার চোথে ঘুম আসিয়াছে, মাঝে মাঝে এক একবার মাত্র ঘুম

ভাঙ্গিয়া জল পান করিতেছেন, আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িতেছেন ; সরাই রক্ষক আজ তাহার ঔষধের গুণ দেখিয়া স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, শীঘ্রই যে মতাহার আরোগ্য লাভ করিবেন সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র নাই—এখন ঔষধটাকে কেমন করিয়া স্বপ্নাদি ঔষধ বলিয়া রাষ্ট্র করে সেই ভাবনা লইয়াই সে শুইতে গিয়াছে। স্বপ্নাদি ঔষধই আর কি তখনকার একমাত্র পেটেণ্ট ঔষধ।

প্রহরেক পরে একবার মতাহারের ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি জল চাহিলেন, কাছেই বৃদ্ধা বসিয়াছিল—তাঁহাকে জল দিল, জলপান করিয়া আবার তিনি নিদ্রিত হইলেন, কিছুক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া বৃদ্ধাও গৃহের এক-পার্শ্বে শুইয়া পড়িল—কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গভীর নিদ্রা-মগ্ন হইল। আবার জাগিয়া যখন মতাহার জল চাহিলেন তখন বুড়ী তাঁহাকে জল দিল না, মতাহার তাহার স্থানে আর একজনকে দেখিলেন, বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখ পানে চাহিলেন, নিঃঝুম ঘুমঘোর হঠাৎ যেন তাঁহার ভাঙ্গিয়া গেল—মুমূর্ষু পাংশু নয়ন একটু জ্বলিয়া উঠিল—মতাহার দুই হাত বাড়াইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"এ কি মহম্মদ ?" মহম্মদ দুই হাতে পিতার দুই হাত ধরিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, দুই জনের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মহম্মদ বলিলেন "বাবা, আমি যে তোমাকে লইতে আসিয়াছি"—

মতাহার অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিলেন "বড় অসময়ে লইতে আসিয়াছিস্, এখন কি আর ফিরিবার সময় আছে বৎস" মহম্মদ তাহা বুঝিয়াছিলেন, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। মতাহার বলিলেন "যখন বাড়ী হইতে চলিয়া আসি তখন মনে হইয়াছিল আর যেন ফিরিতে না হয়—আবার অল্প দিনেই সে কথা ভুলিয়া বাড়ীর পথে ফিরিতে চাহিলাম। কিন্তু আমি যাহা ভুলিয়াছি বিধাতা তাহা ভোলেন নাই।—তাঁহার ইচ্ছায়, এক পথ ধরিতে আর এক পথ ধরিয়া ফেলিয়াছি, এ পথে সাথী মিলেনা, সাথী যাহারা ছিল একে একে সকলেই চলিয়া গেছে, এখন একাকী এই বিজন স্থানে পড়িয়া এই দারুণ পথ উত্তীর্ণ হইবার অপেক্ষা করিতেছি—এ সময় লইতে আসিলি বৎস?" মহম্মদ আকুল কণ্ঠে বলিলেন—"পিতা, তুমি কোথায় যাইবে? তুমি ছাড়া মুন্নার কষ্ট কে নিবারণ করিবে?

মুন্না! সে নামে মতাহারের দুর্ব্বল হৃদয় তরঙ্গিত হইল; তবে মুন্না এখনো জীবিত! প্রতিক্ষণ তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি আকুল হইয়া পড়িতেছিলেন—অথচ কি এক আতঙ্কে সে কথা ওষ্ঠে আসিয়া মিলাইয়া পড়িতেছিল। মতাহার জলপূর্ণ নেত্রে থামিয়া থামিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—"বৎস আমি স্বার্থপর। আমার কষ্ট নিবারণের জন্যই আমি ফিরিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম—তাহার জন্য নহে। আমি ত সেখানে ছিলাম—আমা হইতে কি

তাহার এক বিন্দু কষ্ট নিবারণ হইয়াছে ? আমার চোখের সামনে যে দিন দিন সে শুকাইয়া পড়িতেছিল, চোখের সামনে দিন দিন তার হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল, আর আমি বসিয়া পাষণ্ড নরাধমের মত, রক্তমাংসহীন একটা শবের মত তাহা দেখিতেছিলাম--একটা পাথরও কি তাহা সহ্য করিতে পারিত ? বিধাতা এ প্রাণ বজ্র হইতেও কঠিন করিয়া গড়িয়াছিলেন" !

মতাহার এখনো আপনাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, আপনার অপরাধ ভুলিতে পারেন নাই, হুহু করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্ম সিক্ত হইল, তিনি অবসন্ন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন,—মহম্মদ ব্যস্ত হইয়া অবিশ্রান্ত তাঁহার মুখে জল দিতে লাগিলেন, কিছু পরে ধীরে ধীরে আবার তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল—কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুন্না কেমন আছে"? মহম্মদ সে কথার উত্তর দিলেন না—কিছু পরে বলিলেন—"সলেউদ্দীন চলিয়া গিয়াছেন"—

মতা। "একটি পয়সা রাখিয়া জান নাই ?"

মহম্মদ চুপ করিয়া রহিলেন—মতাহার বলিলেন—"আমি জানিতাম জানিতাম—আমি অনেকদিন হইতে ইহা জানিতাম; কেবল ইহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম—"

মতাহার থামিলেন—একটু দম লইয়া গলা হইতে কবচ উন্মোচন করিয়া বলিলেন—"তাহার অসময়ের জন্য

ইহা অবশিষ্ট আছে। তাহাকে দিও—বলিও তাহার পিতা মৃত্যুকালে শান্তিতে মরিয়াছে—তাহার শান্তির আশা করিয়া শান্তিতে মরিয়াছে—যদি পিতার আন্তরিক প্রার্থনার ফল থাকে--এ আশা ব্যর্থ হইবে না—"

একটা প্রশান্তি তাঁহার বিষণ্ণ মুখে ব্যাপ্ত হইল—একটা গুরুভার যেন তাঁহার হৃদয় হইতে কে টানিয়া লইল—মতাহার করজোড়ে উর্দ্ধনেত্রে বলিলেন—

"নুন্না আমার শান্তি লাভ করিবে। আল্লা আমি জানি এ পাপীর বাক্যও তোমার কাণে পৌঁছিবে"।

মতাহার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ আর তাঁহার কথা কহিবার শক্তি রহিলনা। মহম্মদ আকুল ভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শুশ্রূষায় আর তাঁহাকে জীবন দিতে পারিল না; দুই দিনের মধ্যেই মতাহারের মৃত্যু হইল, মহম্মদ নিরাশ ব্যথিত চিত্তে বাটী যাত্রা করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী।

এদিকে দস্যুগণ বুড়ির বাড়ী হইতে মুন্নাকে লইয়া বন পথে যাত্রা করিল। তখন শেষ রজনী—কৃষ্ণ দ্বাদশীর চন্দ্র শেষ-রাত্রে আকাশে দেখা দিল, মাঠে প্রান্তরে—গঙ্গার বুকে, গাছের মাথায়, পাতার ফাঁকে, দস্যুদের মুখে, হঠাৎ

আলোক ফুটিয়া উঠিল। পাপের অন্ধকার-মূর্ত্তি পেচকের মত অন্ধকারেই লুকাইয়া থাকে, প্রেতের ন্যায় অন্ধকারেই তাহার প্রভাব। আলোকে তাহার ভীষণতা হঠাৎ দস্যুদের চক্ষে পড়িল, হঠাৎ আপনাদের কাজের জঘন্য মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া দস্যুরা কেমন থমকিয়া দাঁড়াইল। এই সময় মাথার উপর একটা পেচক বিকট স্বরে ডাকিয়া উঠিল, তাহাদের পাষাণ নির্ভীক হৃদয়ও কেমন কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে একবার নিস্তব্ধে তাকাতাকি করিয়া পরস্পর ঘেঁসাঘেসি করিয়া দাঁড়াইল তাহার পর দ্রুতগতিতে আবার পা বাড়াইল। কিছুদূর গিয়া আর তাহাদের পা সরিল না। সম্মুখে ও কাহার মূর্ত্তি? জটাজুট-বিলম্বিত আবক্ষ-শ্মশ্রু-শোভিত কেও দেব গম্ভীর মহান পুরুষ—হৃদয়-ভেদী কটাক্ষে চাহিয়া তর্জ্জনী উত্তোলিত করিয়া বজ্রধ্বনিতে তাহাদের আদেশ করিলেন—'দাঁড়াও'? সে আদেশে আকাশ পৃথিবী যেন শিহরিয়া উঠিল—বনের লতাপাতা যেন নিষ্কম্প স্থির হইয়া রহিল, নক্ষত্রের গতি পর্য্যন্ত যেন বন্ধ হইয়া গেল—সেই স্তব্ধতার স্থির সমুদ্রের মধ্যে তাঁহার সেই আদেশ বাণী কেবল তরঙ্গিত স্রোতের ন্যায় স্তম্ভিত অরণ্যের অণুতে অণুতে তান তুলিতে লাগিল। দস্যুরা মন্ত্র-স্তব্ধ শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইল—দেবমূর্ত্তি তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইলেন, প্রহরীর প্রতি মর্ম্মভেদী কটাক্ষে চাহিয়া মুন্নাকে ভূমে নামাইয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন—সে তটস্থ

হইয়া নামাইয়া দিল,—সন্ন্যাসী মুন্নাকে স্পর্শ করিয়া মৃদু স্নেহকণ্ঠে বলিলেন "উঠ বৎসে।" মুন্না উঠিয়া দাঁড়াইল,—তাহার আর শ্রান্তিনাই—ক্লান্তি নাই—তাঁহার পবিত্র স্পর্শে সে যেন অমৃত পান করিয়া সবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—"এস বৎসে আমার সঙ্গে এস।"—তিনি আগে আগে গমন করিতে লাগিলেন, সে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল। বন পার হইয়া রাজ পথে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাইবে বৎসে ?—"

মুন্না কি বলিবে ? কোথায় যাইবে ? তাহার আর স্থান কোথা ? কিন্তু মনের কথা মুখে আসিল না, মনের কথা মনেই মিলাইয়া গেল—তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া—তাহার মুখ আপনি নত হইয়া পড়িল, সে কি বলিল নিজেই বুঝিল না—আস্তে আস্তে বলিল—"বাড়ী"। সন্ন্যাসী তাহাকে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া রাখিয়া গেলেন।

* * * *

এদিকে মুন্নাকে লইয়া সন্ন্যাসী চলিয়া যাইবার কিছু পরে দস্যুদের সে মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল, তাহারা সেই নিস্তব্ধ নিশাকালে—নির্জ্জন বনের মধ্যে আপনাদের দাঁড়াইতে দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল। পরস্পর বিস্ময় নেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল,—সকলেই

সকলকে যেন নীরবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "এখানে কেন আসিলাম?" কিছু পরে একটু একটু করিয়া তাহাদের আগেকার সব কথা মনে পড়িয়া গেল, মুন্নাকে লইয়া এইখান দিয়া চলিয়া যাইতেছিল এই পর্য্যন্ত মনে পড়িল,—কিন্তু তাহার পর? আর কিছুই মনে নাই। কোথায় মুন্না, কেমন করিয়া চলিয়া গেল—কিছুই মনে নাই। ময়না বলিল—"তাইত নবাবকে কি বলিব? এই বনের মধ্যে কোথায় লুকাইয়াছে খোঁজ দেখি"—

দস্যুরা গাছ পালার মধ্যে মুন্নাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় মুন্না—আবার সেই মূর্ত্তি! সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আবার তাহারা সভয়ে দাঁড়াইয়া গেল—সন্ন্যাসী নিকটে আসিয়া—খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে জ্বলন্ত কটাক্ষে তাহাদের সকলের দিকে এক একবার চাহিতে লাগিলেন। হঠাৎ দস্যুগণের মুখে একটা আহ্লাদের চিহ্ন প্রকটিত হইল,—তাহারা সকলে এক সঙ্গে ময়নার দিকে ফিরিয়া বলিল "তাইত এই যে বিবিজি, আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম নাকি, এইখানে থাকিতে আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি!"

সকলে ময়নাকে ধরিতে অগ্রসর হইল,—ময়না অবাক হইয়া বলিল "মরণ ক্ষেপেছিস নাকি—আমাকে ধরিস কেন?" তখনি ময়নার দৃষ্টি সন্ন্যাসীর চোখের প্রতি পড়িল—সে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে তাঁহার দিকে চাহিয়া

থাকিয়া, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল, প্রহরী তাহাকে ধরিতে আসিল—"সে বলিল ধরিতে হইবে না, চল যাইতেছি—" দস্যুদের সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সে নবাব বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে একটি ঘরে বসাইয়া প্রহরী নবাব-শাকে গিয়া খবর দিল—মুন্না আসিয়াছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মোহমুগ্ধ।

যখন প্রহরী জাহানখাঁকে আসিয়া বলিল—মুন্না হাজির, তখন জাহানখাঁর আরক্তিম মুখমণ্ডল একেবারে রক্তহীন হইয়া পড়িল, শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয়ের যত বল অবসান হইল—এতক্ষণ এরূপ সংবাদে যেরূপ আহ্লাদ যেরূপ উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা করিতেছিলেন—তাহা আর সমুখে দেখিতে পাইলেন না, কি যেন একটা অস্বস্তির ভাবে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এতক্ষণ বাসনায় বঞ্চিত হইয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন—এখন কৃতকার্য্য হইয়া মনে হইল, কার্য্যসিদ্ধি না হইলেই যেন ভাল হইত। হায়! মানুষ কি আত্মপ্রতারক—আত্মবিরোধিতার নামই যেন মানুষ।

কিন্তু খাঁজাহানের ওরূপ ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। কিছু পরেই তিনি আত্মস্থ হইলেন, ক্রমে তাঁহার সে ভাব চলিয়া গেল, ক্রমে আর একরূপ ভাব মনে প্রবল হইল, কি করিয়া মুন্নার নিকট অপরাধ-মুক্ত হইবেন, কি রূপে তাহার প্রেমে অধিকারী হইবেন—তাহাই মনে আসিয়া পড়িল। তিনি সবলে হৃদয় বাঁধিয়া মুন্নাকে দেখিবার আশায় প্রহরী-উক্ত গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে পালঙ্কে ময়না ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল কম্পিত হৃদয়ে তাহার নিকট ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ময়না আস্তে আস্তে ঘোমটাটা একটু কমাইয়া দিয়া তাহার মধ্য হইতে নবাবশার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কর্দ্দমোপবিষ্ট শূকরের কর্দ্দমের মধ্য হইতে কর্দ্দম-নিন্দিত মুখটি যেমন বাহির হইয়া থাকে—ঘোমটার মধ্য হইতে ময়নার শূকরী-নিন্দিত মুখখানি তেমনি প্রকাশিত হইতে লাগিল। নবাব-শার চোখের সমুখে যেন শত কীট কিলবিল করি[illegible] উঠিল—তিনি ঘৃণায় ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলে[illegible] ভাবিলেন কোন ঘরে আসিতে কোন ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন,—বাহিরে প্রহরী দস্যুদের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, সেই-খানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় রাখিয়াছ" ? তাহারা আবার ঐ কামরা দেখাইয়া দিল। তিনি গৃহমধ্যে আর একবার প্রবেশ করিয়া চারিদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—ময়না ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে

না পাইয়া প্রহরীকে গৃহে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায়" সে আঙ্গুল দিয়া ময়নার প্রতি দেখাইয়া দিল—তিনি আশ্চর্য্য হইলেন—ভাবিলেন—বুঝি বা ভুল হইয়া থাকিবে, বলিলেন—'ও ত ময়না—অমন করিয়া বসিয়া কেন'?

প্রহরী বলিল—"হুজুর ময়না নহে, আল্লার দোহাই বিবিজি"—যেরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত যেরূপ দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসের সহিত প্রহরী ও কথা বলিল তাহাতে তাঁহার উত্তেজিত ক্রোধ থামিয়া পড়িল, তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার সহিত রঙ্গ করিতে প্রহরীদের সাহস হইবে—তাহা ত হইতেই পারে না, আসল ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি কি করিবেন নিজেই যেন ভাবিয়া পাইলেন না। ময়না এই সময় আস্তে আস্তে উঠিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, জোড় হাতে বলিল—"প্রাণেশ্বর"—নবাবশা সর্প দংশিতের ন্যায় সরিয়া দাঁড়াইলেন—সে আবার নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল "হৃদয়েশ্বর—অধিনী"—তাহার স্পর্দ্ধায় নবাবের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বন বন করিয়া ঘুরিয়া উঠিল, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহরী প্রহরী করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, অসহ্য অসহ্য!—প্রহরীরা শশব্যস্তে আসিয়া হাজির হইল—কিন্তু তাঁহার মুখের হুকুম মুখেই রহিয়া গেল—হঠাৎ এক তেজস্বী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে প্রতিভাসিত হইল—তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁহার দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী যখন জাহানখাঁর নেত্র হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লই-লেন তখন জাহানখাঁ চকিত দৃষ্টিতে ময়নার দিকে নেত্রপাত করিলেন,—সে সৌন্দর্য্যমহিমায় তাঁহার দৃষ্টি যেন ঝলসিয়া গেল, দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে একজন স্বর্গ বিদ্যাধরী দাঁড়াইয়া আছে, গৃহ ঘর দ্বার লোক জন সকলি তাহার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল—তিনি উন্মত্ত ভাবে ময়নার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "প্রেয়সি, প্রাণেশ্বরি—আমার হৃদয় প্রাণ মন যাহা কিছু আছে আজ ও দেবীচরণে সকল উৎসর্গ করিলাম" বলিয়া অবনতজানু হইয়া ব্যাকুলভাবে দুই হাতে তাহার চরণস্পর্শ করিলেন—অমনি তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল,—ময়নার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল—প্রহরীদের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। ময়না ভীত হইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। প্রহরীগণও ভয়-স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া রহিল, নবাবশা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটা গভীর স্বপ্নের মাঝখানে সকলে যেন জাগিয়া উঠিল। ঘৃণায় লজ্জায় নবাবশার হৃদয় পূরিয়া গেল, সন্ন্যাসী তাঁহার কাছে সরিয়া আসিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে তাঁহার মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিয়া বলিলেন—"বৎস এ মোহ এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল—কিন্তু যে মোহে অন্ধ হইয়া ইহা হইতে ঘৃণার কাজ অকুণ্ঠিত চিত্তে করিতে উদ্যত, অন্ধকারময় পাপকে আলোক বলিয়া ধরিতে উদ্যত—সে মোহ সে ভ্রান্তি কি ভাঙ্গিবে না?" বলিয়া সে মূর্ত্তি ক্রমে মিশাইয়া পড়িল। খাঁজাহান চমকিয়া

উঠিলেন, সত্যের একটা আলোক বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া, হৃদয় ভস্ম করিয়া দিয়া, যেন চলিয়া গেল—পরক্ষণেই গভীর একটা অন্ধকার হৃদয় অধিকার করিল, ঘৃণায় লজ্জায় অনুতাপে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। ময়না ও প্রহরীগণ ভয়ে কম্পমান হইয়া পড়িয়াছিল—নাজানি তাহাদের আজ কি দশা হইবে—কিন্তু নবাব তাহাদের কিছুই না বলিয়া নীরবে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর একাকী সেই দগ্ধ-হৃদয় লইয়া, অনুতাপের অশ্রু ফেলিয়া, সে রাতটুকু অতি-বাহিত করিলেন। যখন প্রভাত হইল, তাঁহার অশ্রু জলের মধ্য দিয়া উষার নবরাগ যখন ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার জীব-নের তিনি নূতন প্রভাত দেখিতে পাইলেন।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

একাকিনী।

মুন্নাদের বাড়ীর দ্বারদেশে যেখানে সন্ন্যাসী মুন্নাকে পৌঁছিয়া রাখিয়া গেলেন—মুন্না সেই খানেই নিস্তব্ধে দাঁড়া-ইয়া রহিল, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার আর পা উঠিল না। সে বাড়ী কি আর তাহার আপনার বাড়ী? সে বাড়ী কি আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে? এখানে

থাকিতে আর কি খাঁজাহানের হাত হইতে তাহার নিস্তার আছে? আজ তিনি না হয় বিফল হইয়াছেন কাল আবার সফল হইবেন। তবে জানিয়া শুনিয়া আগুণে ঝাঁপ দিতে কি করিয়া সে আবার ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিবে!

মুন্না দেখিল সেখান হইতে দূরে না গেলে আর উপায় নাই, যেখানে জন্মিয়া লালিত পালিত হইয়াছে, যেখানে জীবনের আশা বাসনা, স্নেহ প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে, ফুটিয়াছে, আবার ঝরিয়া পড়িয়াছে, যেখানে নদীর তরঙ্গে তাহার হৃদয় নাচিয়াছে, ফুলের সঙ্গে প্রাণ ফুটিয়াছে— শিশিরের সঙ্গে অশ্রু ঝরিয়াছে, যেখানকার গাছ পালা নদী পুষ্করিণী, পাখী পক্ষী সকলেই তাহার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, সকলেই তাহার আপনার—মুন্না দেখিল—তাহার সেই আপনার স্নেহময়, শত স্মৃতিময় নিবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া না গেলে আর উপায় নাই। পীড়িত ক্লান্ত নেত্রে মুন্না চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বাড়ীর কঠিন দেয়াল, দরজা জানালা গুলা, বাগানের প্রত্যেক গাছের পাতাটি ফুলটি পর্য্যন্ত সে অতৃপ্ত আগ্রহের নয়নে দেখিতে লাগিল, তাহাদের যে সে এত ভাল বাসে তাহা মুন্না আগে যেন জানিত না। তাহার নয়নের শতধারার মধ্যে, বাল্যের খেলাধূলা, কৈশোরের হর্ষ আশা, যৌবনের অশ্রু নিরাশা, স্মৃতির সহস্র ছবি জীবন্ত হইয়া উঠিয়া—মুন্নাকে বাঁধিবার জন্য চারি দিক হইতে তাহাদের স্নেহের শত বাহু প্রসারণ করিয়া

দিল, মুন্না আর দাঁড়াইল না—তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যাইবার আগে—ভোলানাথের কথা—ভোলানাথের সেই আত্মবিসর্জ্জী স্নেহ মনে পড়িল, একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু ভোলানাথ এখন কোথায়? তাঁহার দেখা মুন্না এখন কোথায় পাইবে? আর যদিই বা এখন তাঁহার সহিত মুন্নার দেখা হয় তাহা হইলে তিনি কি তাহাকে একাকী যাইতে দিবেন? মুন্নার জন্য ভোলানাথ অনেক কষ্ট সহিয়াছেন, আর কেন নিজের ছিন্ন-অদৃষ্টের সহিত তাঁহাকে বাঁধিয়া তাঁহার শেষ সুখ শান্তির আশাটুক পর্য্যন্ত মুন্না নষ্ট করে। মুন্নার আর সে ইচ্ছা রহিল না—মুন্না আর কাহারো জন্য অপেক্ষা না করিয়া একাকী চলিয়া গেল। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলের বালা একাকিনী অনাথিনী কেবল অশ্রুজল সাথী করিয়া সংসারের সমুদ্র তরঙ্গে আপনার অদৃষ্ট অন্বেষণ করিতে ভাসিয়া পড়িল।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

করুণা।

তাহার পর একদিন একরাত্র চলিয়া গিয়াছে। আবার নূতন প্রভাত হইয়াছে, কাল রাত্রে যে রবি পশ্চিমে ডুবিয়াছিল—আজ আবার তাহা পূর্ব্বে উদিত হইয়াছে, ঘুমন্ত গাছ পালা, ঘুমন্ত ভাগিরথী ঘুমন্ত পৃথিবী সূর্য্যকর স্পর্শে হাসিমুখে জাগিয়া উঠিয়াছে, কেবল দীনবেশা অভাগিনী মুন্না সমস্ত দিনের পর কাল সন্ধ্যাবেলায় যেরূপ শ্রান্ত ক্লান্ত ম্লানমুখে গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে আজও সেইরূপ ম্লানমুখে সেইখানে বসিয়া আছে—সে মুখে আর হাসির রেখা নাই। মুন্নার হৃদয় মধ্যে অগ্নিময় মরুভূমি, সে মরুর প্রজ্জ্বলন্ত বালুকা স্ফুলিঙ্গ উচ্ছসিত হইয়া উচ্চে নীচে দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া—তাহার চারিদিকে অসীম অপার ধূধূকারী নিরাশা স্বজন করিয়াছে, এ ক্ষুদ্র জীব এ অগ্নিসমুদ্র পার হইবার তাহার আশা নাই। তাহার মনে হইতেছে ইহার তুলনায় সে এতদিন চিরবিরাজমান বসন্তের নিকুঞ্জে বাস করিতেছিল—সুখের নিকুঞ্জে, বসন্তের মধুসঙ্গীত তাহাকে প্রফুল্ল করিতে পারে নাই, সুখের ভোগে মুন্না সুখ চিনিতে পারে নাই, দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত্যায় যখন সে বসন্ত মরিয়া গেল, সে সুখগীতি থামিয়া গেল—তখন মুন্না তাহার জন্য হায় হায় করিতেছে। কিন্তু হায়! এখন

আর সহস্র হায় হায়েও তাহা ফিরিবে না—যাহাকে একবার তাচ্ছিল্য করিয়া পদাঘাতে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে—সহস্র আহ্বানে সে আর কাছে আসিবে না। সেই যে একদিন পিতার প্রাণ-ঢালা-স্নেহ, মসীনের নিঃস্বার্থ সমবেদনা সুধার মত তাহার উপর বর্ষিত হইত, তাহার সে দিন কত সুখের দিন, আর সেই যে দিনান্তে একবার করিয়া স্বামীকে দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে মুন্না ফিরিয়া আসিত তাহার ভিতরেই বা তাহার কতখানি সুখ। তখনকার যাতনার দীর্ঘ নিশ্বাসে, অশ্রুজলে পর্য্যন্ত কি গভীর সুখ লুকাইয়া ছিল—মুন্না সে সুখ তখন বোঝে নাই, কেবল দুঃখ দুঃখ করিয়াছে, জগৎকে যাতনাময় ভাবিয়াছে, তাই জগৎ তাহাকে দুঃখ চিনাইয়া দিল, সুখ মুন্নার কৃতঘ্নতার প্রতিশোধ লইল।

অতীতের মোহমায়ায় দুঃখের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুন্নার নিকট এখন সুখের। যাহার স্মৃতিতেও সুখ নাই, আলোক-রেখাশূন্য একটি অতলস্পর্শ আঁধার সমুদ্রে যে ডুবিয়া আছে, তাহার দুঃখ কল্পনা করিতে কল্পনা স্তম্ভিত হয় হৃদয় অবশ হইয়া পড়ে—এরূপ দুঃখ জগতে আছে কিনা জানি না—যদি থাকে তাহাই পাপী হৃদয়ের নরক ভোগ। পাপই স্মৃতিকে মুছিতে চায়, পাপের জীবনই অতীতের দিক হইতে সভয়ে চক্ষু ফিরাইতে চায়, কিন্তু পাপহীন হইলে অতীতের সহস্র দুঃখও সুখের বেশ ধারণ করিয়া হাসিয়া মনে উদয়

হয়। তাই বলিতেছি পাপীই যথার্থ দুঃখী, তাহা ছাড়া জগতে যথার্থ দুঃখী বুঝি আর কেহ নাই।

ক্রমে অল্প অল্প রোদ উঠিল, এক দল ভিক্ষুক সেই গাছ তলার কাছ দিয়া জয় জয় করিতে করিতে ভিক্ষায় গমন করিল, মুন্না চাহিয়া দেখিল। মুন্নাও ভিখারিণী—তাহারো ঐরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার প্রাণের ভিতর বেগে একটা ঝড় বহিয়া গেল। যখন হইতে সে বাড়ীর বাহির হইয়াছে—মাঝে মাঝে ঐ ভাবনা আসিয়া তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিতেছে। মুন্না ভাবিল "মাগো তাহা কি করিয়া করিব!—দুয়ারে দুয়ারে হাত পাতিয়া বেড়াইব কি করিয়া"? মুন্না কাঁদিয়া বলিল—"মৃত্যু-কোথায় তুমি, যাহার কেহ নাই—তুমিই তাহার আশ্রয়, -তুমি তাহাকে রক্ষা কর—তুমি তাহাকে শান্তি দাও—" এত দিন কষ্টে যাহা তাহার মনে আসে নাই—এখন ক্রমাগত তাহাই তাহার মনে আসিতে লাগিল। মুন্না দেখিল আত্মহত্যা ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই, মুন্না দেখিল সেই মহা পাপের বক্ষঃই এখন তাহার একমাত্র আশ্রয় স্থান,—মুন্না হাঁটুতে মাথা রাখিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল,—সে সারা-জীবন এত কান্না কাঁদিয়াছে—কিন্তু এমন কান্না কখনো কাঁদে নাই,—এই তাহার প্রথম পাপে প্রবৃত্তি,—জানিয়া শুনিয়া সে মহাপাপ করিতে যাইতেছে,—পাপ করিবার আগেই সে পাপের যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল,—তাহার

মনে হইল—তাহার দেহ মন পাপে জরজর হইয়াছে—অথচ তাহা হইতে ফিরিতেও যেন তাহার সাধ্য নাই,—এমনতর অবস্থায় মুন্না আগে কখনো পড়ে নাই।

হঠাৎ তাহার সে মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল—সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, চোখের জল মুছিয়া সে সংযত হইল, মনে মনে দৃঢ় স্বরে বলিল—"ছিছি এ কি ভাব? আত্মহত্যা করিব? মানুষ হইয়া—দুঃখকে পদানত করিতে পারিব না দুঃখের পদতলে দলিত হইব? দুঃখ আমাকে ভয় করিবে না—আমি দুঃখের ভয়ে আত্মহত্যা করিব, মনুষ্যত্ব হত্যা করিব? কখনই না। সহ্য করাই মনুষ্যত্ব—যখন মানুষ হইয়াছি সহ্য করিতে ডরাইব না—অনেক সহিয়াছি—আরো সহিব, চিরকাল দুঃখের ভ্রূকুটি সহিয়াছি—এখন দুঃখকে ভ্রূকুটি করিতে শিখিব"—

মুন্না বুঝিল এ অবস্থায় ভিক্ষাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য,—যাহা বুঝিয়াছে—কাজে তাহা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট বল চাহিতে লাগিল, প্রার্থনা করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল,—কিন্তু দুই এক পদ গিয়া তাহার সমস্ত বল—তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প সমস্তই যেন অবসান হইল,—আবার নিকটের একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

মুন্না আবার সে সঙ্কোচ সবলে দমন করিতে চেষ্টা করিয়া মনে মনে বলিল—"হাঁ ভিক্ষা করিব বই কি? কিন্তু একা কোথায় যাইব, কেউ আসুক আগে"—এক দল

ভিক্ষুক যাত্রী তাহার কাছ দিয়া চলিয়া গেল,—এই ঠিক অবসর,—মুন্না উঠি উঠি করিল—অথচ উঠিতে পারিল না—ভিক্ষুকেরা অনেক দূরে চলিয়া গেল—ক্রমে অদৃশ্য হইল, মুন্না ভাবিল, আর এক দল আসুক"—এইরূপে এক দলের পর এক দল ভিক্ষায় যাইতে লাগিল, ভিক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, একপ্রহর কখন চলিয়া গেছে, দ্বিপ্রহরও চলিয়া গেল—মুন্না তবুও সেই গাছতলায় বসিয়া রহিল, এখন না তখন করিয়া বেলা অবসান হইল, এক-জনও ভিক্ষুক আর রাস্তায় দেখা যায় না—দুই এক জন পথিক মুন্নার কাছে আসিয়া দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল—ভাল উত্তর না পাইয়া চলিয়া গেল, দুই একজন তাহার কাছে গাছতলায় আসিয়া বসিল—মুন্না সেখান হইতে উঠিয়া আর একটি নিভৃত বৃক্ষতলে গিয়া বসিল। বিকাল গেল—সন্ধ্যা আসিল—মুন্নার আর সেদিন ভিক্ষা করা হইল না—মুন্না সেই গাছতলায় অনিদ্রায় অনাহারে শুইয়া ভাবিতে লাগিল—"এমন করিয়া আর কদিন চলিবে?—যখন ভিক্ষা করিতে হইবেই, তখন আর কিসের সঙ্কোচ?—কিসের আর মান অপমান, কিসের এত লজ্জা? এক কালে রাজার মেয়ে ছিলাম—এখন আর তাহাতে কি? এখনত আর তাহা নাই। এক কালে স্বর্ণমুষ্টি ছড়াইতে পারিতাম বলিয়া এখন অন্ন ভিক্ষা করিতে লজ্জা করিবে? এক কালে ফুলের বিছানায় শুইতাম এখন যে কঠিন

মাটিতেও আশ্রয় নাই। চিরদিন কাহার সমান যায়? এক কালে যাহা ছিল তাহা কি আর আছে, তবে আর কিসের সঙ্কোচ! মুন্না সমস্ত রাত ধরিয়া এইরূপে ভাবিতে লাগিল—সমস্ত রাত ধরিয়া হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিল, প্রাতঃকালে একদল ভিক্ষুক দেখিবামাত্র প্রাণপণে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র হৃদয়ে অপরিমিত বল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মলিন চাদরখানি দিয়া নাসিকা চক্ষু ছাড়া আর সকল ঢাকিয়া ফেলিল, তারপর ভিক্ষুক যাত্রীদের অনুগামী হইল। ভিক্ষুকগণ জয় হউক বলিয়া এক গৃহ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক পাত্র চাউল লইয়া একজন মুষ্টি বাঁটিতে লাগিল, সেই এক মুষ্টি চালের জন্য এক হাতের উপর দশটা করিয়া হাত পড়িতে লাগিল, একজনকে ঠেলিয়া দশজন সবলে ভিক্ষাদাতার সম্মুখে আসি[illegible]র চেষ্টা করিতে লাগিল—মুন্না সেই জনতার মধ্যে দাঁড়াইতে সাহস না করিয়া কিছু দূরে একজন দর্শকের মত দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য সকলে ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল—ভিক্ষাদাতা থালা ঝাড়িয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। মুন্না দেখিল—সেখানে আর ভিক্ষা পাইবার আশা নাই—নিরাশ হৃদয়ে আবার সে ভিক্ষুকদের অনুগমন করিল। আবার আর এক ঘরে পঁহুছিয়া যখন ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা লইতে লাগিল, তখন মুন্না পূর্ব্বাপেক্ষা সে দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া সাহস পূর্ব্বক দাঁড়াইল—কিন্তু যাচি[illegible] করিতে মুখ ফুটিল না—হাত উঠিল না, একবার

যেন হাতটি উঠাইয়াছিল কিন্তু তখনি তাহা পড়িয়া গেল—কেহ তাহা দেখিতে পাইল না—কেহ জানিলনা মুন্না ভিখারিণী। ভিক্ষা শেষ হইল, অন্য সকলে চলিয়া গেল, মুন্নার আর পা সরিল না—শূন্য হস্তে অধোবদন হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বিধাতা! এত লোক ভিক্ষা লইয়া গেল মুন্নার এক মুটা ভিক্ষা পর্য্যন্ত জুটিল না!

সংসারের নিয়ম মুন্না জানেনা। চীৎকার না করিলে, গলাবাজি করিয়া বেড়াইতে না পারিলে ভিক্ষুক হইতে রাজার পর্য্যন্ত কাহারো জয় নাই তাহা মুন্না জানে না, গলার জোরে ঝুটা সাঁচ্চা হইয়া যায়, আর তা না থাকিলে সাচ্চা কানা কড়িতে বিকায় না—তাহা মুন্না জানে না। মুন্না জানে—সান্ত্বনার পাত্রকে জগৎ আপনি চিনিয়া লইবে। লোক দেখাইয়া অশ্রুজল ফেলিতে হয় তবে জগৎ মহা আড়ম্বর করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী তোলপাড় করিয়া এক মুষ্টি অন্ন দেয় তাহা মুন্না জানে না। মুন্না কখনো বাড়ীর বাহির হয় নাই—সে সংসারের ধার কি ধারে? যখন বাড়ীর বাহির হইতে হইল তখন একেবারেই ভিক্ষা পাত্র লইয়া বাহির হইয়াছে। এতদিন ভিক্ষা দিয়া—একেবারে ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে। ভিক্ষা লইবার কি ধারা তাহা সে জানে না—তাই সে ভিক্ষা পাইল না।

তুই দ্বারে যখন মুন্না ভিক্ষা পাইল না, তখন সে দিন আর তাহার ভিক্ষা করা হইল না—সেখান হইতে ধীরে

ধীরে ফিরিয়া পূর্ব্বের গাছতলাটিতে গিয়া বসিল। দ্বিপ্রহর হইল রৌদ্র তাপে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল, পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তবু যেন এতটুকু বল নাই—যে উঠিয়া নদী তীরে গিয়া জল পান করে—মুন্না শ্রান্ত ক্লিষ্ট অবসন্ন হইয়া সেই বৃক্ষতলে শুইয়া রহিল।

কিছু পরে বেহারারা একখানি পালকি এই বৃক্ষতলে আনিয়া নামাইল। এক জন ভদ্র মহিলা ইহার মধ্যে ছিলেন সঙ্গে এক জন দাসী দুই জন দ্বারবান। পালকি নামাইলে একজন দ্বারবান বলিল--"বোট ঠিক হইয়াছে কি না দেখি, ততক্ষণ মাঠাকরুণ এইখানে থাকুন।" দ্বারবান চলিয়া গেল—দাসী বলিল--"মা পালকির দরজা খুলিয়া দেওনা এখানে কেহ নাই।" পালকির দ্বার খুলিয়া রমণী পালকীর মধ্য হইতে মুখ বাহির করিলেন, অমনি বৃক্ষতলে মুন্নার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, দাসীকে বলিলেন "আহা দেখ দেখ কি রূপ দেখ।" দাসী তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"ও মা তাই ত গা, তা সাজে দেখছি কোন মোছলমানের মেয়ে হবে।" রমণী বলিল, "ওকি লো—মোছলমানের ঘরে কি অত সুন্দরী আছে—না লো হিন্দুস্থানী খোট্টা"—রমণী আর না থাকিতে পারিয়া, পালকীর বাহির হইয়া মুন্নার নিকটে আসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ গা কে তুমি?" মুন্না—অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল—"আমি ভিখারিণী?"

ভিখারিণী! এত রূপ একটা রাজার ঘরে নাই, ভিখারিণীর এত রূপ! রমণী অবাক হইলেন, সেই ম্লান সৌন্দর্য্যে যেন অভিভূত হইলেন—সেই সুন্দর মুখখানি ম্লান বিষণ্ণ শুষ্ক নলিনীর ন্যায় দেখিয়া তাঁহার যেন চ'খে জল আসিতে লাগিল—অতি করুণার স্বরে রমণী বলিলেন—"এই দুপুর বেলায় একটি গাছ তলায় পড়ে আছ, কোথায় যাইবে গা ?"

মুন্না বলিল—"গাছতলাই আমার ঘর।" রমণীর বড় দুঃখ হইল—বলিলেন, "আহা তোমার ঘর নাই—তবে রাত্রে কোথায় থাকিবে—বৃষ্টি হইলে কি করিবে।"

মুন্নার চোখ দিয়া এক বিন্দু জল পড়িল—নিজের অবস্থা ভাবিয়া এ অশ্রু বাহির হইল না—একজন অজানা অচেনা পথের লোকের এত মমতা! তাই মুন্নার তাহা হৃদয় স্পর্শ করিল। মুন্না করুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"যাহার এক মুটা অন্ন জুটে না সে থাকিতে ঘর কোথায় পাইবে ?"

রমণীর কোমল প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল, বলিল—"আমার সঙ্গে যাইবে ? আমার সঙ্গিনীর মত থাকিবে, আর ভিক্ষা করিও না।"

অতি ক্ষীণ বিদ্যুতের মত হাসি হাসিয়া মুন্না বলিল—"আমি মুসলমান। জানিলে আমাকে কি তুমি স্পর্শ করিবে।"

"মুসলমান!" রমণী একটুখানি ভাবিল, তারপর বলিল—"আমি ভাবিয়াছিলাম খোট্টার মেয়ে। তা হোক্ হলেই বা মুসলমান, একটা আলাদা ঘর দেব—সেইখানে থাকবে, আমাদের অন্ন কত লোকে খায়—আর তোমার মত ভিখারিণী শুকাইবে? চল।"

একজন বিজাতি সম্পর্কহীন অপরিচিতের তাহার জন্য এই সমদুঃখ দেখিয়া মুন্না আশ্চর্য্য হইল—মনে মনে বলিল—"ধন্য তুমি হিন্দু কন্যা। আমার মত অভাগিনী তোমার এই মমতার কি প্রতিদান দিবে—বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন"। হঠাৎ রমণীর কি মনে হইল,—জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তোমার কিছু খাওয়া হইয়াছে?"

মুন্না কোন উত্তর করিল না। রমণী বুঝিলেন তাহার খাওয়া হয় নাই। প্রথমেই ইহা বুঝেন নাই বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। রমণী কিছু দূর হইতে আসিতেছিলেন—সেই জন্য তাহার সঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন ও প্রয়োজনীয় দুই একখানি বাসনও ছিল। তিনি দাসীকে তাড়াতাড়ি একটি ঘটি দিয়া জল আনিতে পাঠাইলেন আর নিজে মিষ্টান্ন লইয়া মুন্নার হাতে দিলেন। মুন্নার তখন আর ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না—তাঁহার করুণা পাইয়াই সে শ্রান্তি অবসাদ ক্ষুধা তৃষ্ণা সকল ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রমণীর অনুনয় বিনয়ে দুই একটি মিষ্টান্ন গ্রহণ না করিয়া মুন্না নিস্তার পাইল না। কিছু পরে যে দ্বারবান

ঘাটে গিয়াছিল সে আর একজন চাকরের সহিত এইখানে ফিরিয়া আসিল। চাকর বোট ঠিক করিবার জন্য আগেই এখানে আসিয়াছিল। চাকর রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এস মা, ঘাটে বোট আসিয়াছে। কতকষ্টে যে এই বোটখানি ঠিক করেছি—তা আর কি বলব।" রমণী বলিল, "কেনরে বেহারী বোট ঠিক করতে এত কষ্ট কিসের ?" চাকর বলিল—"কোথা পশ্চিম মশ্চিম কোথা থেকে সেরজঙ্গ না কে এক ভারী নবাব এসেছে, তাঁ আবার দেশে শীঘ্র ফিরে যাবে—তা এখন থেকে ঘাটের যত বোট পেঁড়োর খালে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখছে।"

মুন্না শুনিয়াছিল সেরজঙ্গের কন্যাকে স্বামী বিবাহ করিয়াছেন--তাহার নাম শুনিয়া মুন্নার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা নবাব বাড়ী কি পেঁড়োয় ?"

চাকর বলিল—হাঁ গো।"

"সে এখান হইতে কতদূর ?"

"এখান হইতে এখন নৌকায় চড়িলে সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছান যায়; দু চার খান বোট যা ঘাটে আছে এখনি সেখানে যাইবে"।

মুন্না মনে মনে কি ভাবিল, বলিল—"যদি বোট নবাব বাড়ীতেই যাইতেছে, আমি যদি সেখানে যাইতে চাই ত সঙ্গে লইবে কি ?"

রমণী বলিলেন—"তুমি সেখানে যাবে কেন ?"

মুন্না বলিল—"সেখানে আমার চেনা শুনা আত্মবন্ধু আছে।"

রমণী তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"জিজ্ঞাসা করিয়া এস দেখি ; ইহাকে নৌকায় লইবে কি না ?" ভৃত্য বলিল—"আপনার পালকি ঘাটে আনুক, ঘাটে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

পালকি ঘাটে লাগিল,—দাসী দ্বারবান চাকরদিগের সহিত মুন্নাও ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার প্রাণে কি এক আশা হইয়াছে, দুঃখ কষ্ট শ্রান্তি অবসাদ সকল ভুলিয়া গিয়া সে আশার বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। ঘাটে আসিয়া চাকর বোটওয়ালাদের ঐকথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা বলিল—"দাসী পাইলে লইয়া যাইবার হুকুম আছে, যদি দাসী হয় ত আসিতে বল।" মুন্না বলিল "বল হাঁ দাসী।"

মুন্না রমণীর কাছ হইতে বিদায় লইল—রমণী তাহার হাতে কয়েকটী মুদ্রা দিতে গেলেন, মুন্না তাহা না লইয়া বলিল—"বোন, রাজরাজেশ্বরী হও—তুমি আজ আমাকে যে ধন দিয়াছ তাহা অমূল্য, আর আমার কিছু আবশ্যক নাই, তোমার কাছে আর কিছু লইব না। সকল ভিখারিণী যেন তোমার মত হিন্দুকন্যার নিকট এইরূপ প্রাণঢালা সান্ত্বনা পায়—বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন।' রমণী বুঝিল, মুন্না আপনার লোকের কাছে যাইতেছে,

তাহার প্রাণে সুখের উচ্ছ্বাস 'জমিয়াছে। রমণী বলিলেন—"তুমি সুখী হইলে তোমার মলিন মুখখানি প্রফুল্ল হইলে আর একদিন যেন আমি তোমাকে দেখিতে পাই, কিম্বা যদি দুঃখে পড়িয়া কখনো সান্তনার আবশ্যক হয় তখনো ভগিনী মনে করিয়া আমার কাছে আসিও।" রমণী তাহার ঠিকানা বলিয়া দিলেন, মুন্না গদগদ কণ্ঠে বলিল—"যদি আর ভিক্ষা করিতে হয় আগে তোমার দুয়ারেই যাইব।"

রমণী নৌকায় উঠিলেন—মুন্নাও নৌকায় উঠিল। সেখানে গিয়া স্থির হইয়া বসিয়া যখন তাহার চিন্তা করিবার অবসর হইল তখন মুন্নার মনে হইল, "আমিত যাইতেছি, সপত্নীর দাসী হইয়াও যদি দিনান্তে একবার করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই সেই আশায় যাইতেছি—কিন্তু যদি—" মুন্না শিহরিয়া উঠিল। "কিন্তু তা কি পারিবেন? আমিত আর কিছু চাহি না, কেন শত শত দাসদাসী পালন করিতেছেন, আর অভাগিনী মুন্নার—" আবার ঐখানে মনের কথাটা বাধিয়া গেল! মুন্নার প্রাণে আবার কেমন একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিষ্ঠুরতা।

বসন্তকালের দিন, বিকালে যখন মেঘ করে তখন প্রায়ই হঠাৎ মেঘ করিয়া আসে, বাতাস উঠে, বৃষ্টি পড়ে, হঠাৎ পাখীদের গান থামিয়া যায়—সুকুমার বসন্ত ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে। আজও তাহাই হইল। নৌকা নবাবের বাড়ী পৌঁছিবার অল্পক্ষণ আগেই আকাশে মেঘ করিল, জমাট বাঁধিল, ক্রমে আকাশ ঢাকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন আরম্ভ হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারার সহিত গঙ্গার উভয় কূলের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের শোক সঙ্গীত উঠিয়া নদী বক্ষে তুফান তুলিতে লাগিল। প্রকৃতির ভীষণভাব দেখিয়া মুন্না ভীত হইল—তাহারি অমঙ্গল যেন জগৎ ভীম গর্জ্জনে সূচনা করিতেছে, তাহারি অদৃষ্টের অন্ধকার যেন বিশ্বচরাচর গ্রাসিয়া ফেলিয়াছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকা নবাবের বাটীর সমুখের খালে আসিয়া পৌঁছিল। একজন মাঝি মুন্নাকে সঙ্গে করিয়া নবাব বাটীর দ্বারে লইয়া আসিল। নূতন দাসী আসিয়াছে খবর পাইয়া নবাববাড়ীর এক জন দাসী সেখান হইতে তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। যখন দাসী প্রথমে

ঘরে আনিয়া দীপালোকে মুন্নার মুখ দেখিতে পাইল—সে চমকিয়া গেল—দাসীর এরূপ !

অন্তঃপুরে পা দিবামাত্র মুন্না দেখিল বাহিরের ভাবের সহিত এখানে কত প্রভেদ। এখানে চারিদিকে কি সুখের ভাব বিরাজমান! এখানে ঝটিকার রাক্ষসী-মূর্ত্তি নাই—ঝড় বৃষ্টির উৎপীড়ন নাই, বাহিরের ভীষণতাকে কোমল করিয়া ঝটিকার প্রাণের ভিতর দিয়া—নূপুরের রুনুঝুনু, সঙ্গীতের মধুতান চারিদিকে উথলিয়া উঠিতেছে, বজ্র বৃষ্টি ভিন্নকণ্ঠে সে তানে কেবল যেন তান মিলাইতেছে।

মুন্নাকে সঙ্গে করিয়া একটি কক্ষদ্বারে আসিয়া দাসী বলিল—"তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি খবর দিয়া আসি।" দাসী চলিয়া গেল। হাসির তরঙ্গ, নৃত্যগীত গান বাদ্যের উচ্ছ্বাস গৃহমধ্য হইতে সুস্পষ্টরূপে মুন্নার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল, মুন্না বুঝিল এ গৃহে স্বামী সপত্নীর সহিত উৎসবে মাতিয়া রহিয়াছেন, মুন্না এতক্ষণ অতি মৃদু যে আশা হৃদয়ে ধরিয়াছিল সহসা তাহা নিভিয়া গেল। এত-দূর আসিয়া মুন্নার প্রাণ আবার ফিরিয়া যাইতে চাহিল। স্বামীর করুণার উপর অবিশ্বাস আসিয়া পড়িল—যদি চিনিয়া স্বামী নির্দ্দয় পদে তাহাকে ছুড়িয়া ফেলেন! তাহার পাংশু-আনন জ্যোতিহীন, হৃদয় স্তম্ভিত, অধর ওষ্ঠ মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল। এই সময় একবার গান বাদ্য থামিয়া পড়িল, বামাকণ্ঠে কে বলিল—"আচ্ছা তাহাকে একবার

নিয়ে এস, রূপটা কিরূপ দেখা যাক।” আর একজন স্ত্রীলোক তাহার উপর বলিল—“বেগম সাহেব, রূপ দেখিবার এতই যদি সাধ একখানা আর্শি সমুখে রাখলেই ত হয়, রূপের ভাণ্ডারে কি আর কিছু বাকী রেখেছ?”

আর একজন বলিল—“তোমার সখীকে ঐ কথা বুঝাইয়া বল ত, আমার কথায় ত বিশ্বাসই হয় না।”

মুন্না শেষের স্বরে, স্বামীর কণ্ঠ চিনিতে পারিল, কতদিন পরে সে স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল—কিন্তু তবুও সে স্বর যেন এ স্বর নয়—এস্বরে আর সে স্বরে—কত আকাশ পাতাল প্রভেদ। অমন সুস্পষ্ট, কোমল, সোহাগ মাখা—প্রেমময় কথা স্বামীর মুখে কখনো মুন্না শুনে নাই। মুন্নার স্তম্ভিত হৃদয় দিয়া বেগে শোণিত বহিতে লাগিল—বুক দুর দুর করিতে লাগিল, হাত পা থর থর কাঁপিতে লাগিল। দাসী যখন আসিয়া তাহাকে বলিল—“ঘরে এস”—মুন্নার যেন তখন সকল শক্তি অবসান হইয়াছে,—মুন্নার মাথায় মধ্যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, মুন্না কিছু না বুঝিয়া কিছু না শুনিয়া অজ্ঞানের মত দাসীর অনুসরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, কাহাকে দেখিতে ব্যগ্র হইয়া আকুল নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল,দেখিল রত্নালঙ্কৃতা যুবতীর পার্শ্বে স্বামী উপবিষ্ট। মুন্না দেয়ালে ঠেস দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। সলেউদ্দীন তাহাকে চিনিতে পারিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—বুঝি রোসেনারার নিকট এইবার সব

ফাঁস হইয়া যায়! মুন্নার বেশ দেখিয়া রোসেনারার মায়া হইল—তিনি দাসীদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা ওর অমন এলোথেলো বেশ কেন।" তার পর মুন্নাকে বলিলেন—"দাসি তোমার নাম কি?" সলেউদ্দীন বলিয়া উঠিলেন,—"নাম! কোথায় রাস্তা থেকে কোন একটা ভিক্ষুককে ধরে এনেছে—ওর আবার নাম? ও আবার দাসী? ওকে কি দাসী রাখতে হবে নাকি?"

বজ্র হইতে অধিক বলে সে কথা মুন্নার বুকে বাজিল; তাহার হৃদয় শতধা হইয়া যেন ফাটিয়া গেল, এতক্ষণ বহু কষ্টে সে যে আত্ম সংবরণ করিয়াছিল আর পারিল না, পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর চরণ ধরিয়া মর্ম্মভেদী-স্বরে বলিয়া উঠিল—"স্বামি গো বড় আশা করিয়া আসিয়াছি, শরণাগত দাসীকে পায়ে স্থান দাও—তোমা ভিন্ন আমার কেহ নাই—আমাকে তাড়াইও না।"

বলিয়া অস্ফুট আকুল স্বরে মুন্না কাঁদিয়া উঠিল। একজন সামান্য দীন হীন স্ত্রীলোকের এই ব্যবহার দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল, নবাব শা কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া আঁকুবাকু করিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। মুন্না কখনো যাহা করে নাই আজ তাহা করিল—মুন্না তাহার কোমল ঘর্ম্মাক্ত হাত দিয়া তাঁহার পা দুখানি জোরে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "স্বামি,

তোমার এই চরণই আমার আশ্রয়। এ আশ্রয় সরাইয়া লইয়া তুমি কোথায় যাইবে? অন্য সৌভাগ্যবতী রমণীকে বিবাহ করিয়াছ কর, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আমার সঙ্গের অশান্তি তোমাকে স্পর্শ না করুক ইহা আমি হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটি ধূলিকণার মতও কি আমি ঐ চরণ তলে ঠাঁই পাইব না? তুমি বিবাহ করিয়াছ, রাজ্য ঐশ্বর্য্য পত্নী পুত্র সকলি পাইয়াছ—সকলি পাইবে—সকলেই তোমার আপনার, কেবল কি এই আশ্রিত দাসীই তোমার আপনার রহিবে না নাথ"? সলেউদ্দীন মুন্নার এই ক্রন্দনে, এই আচরণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, নবাবপুত্রী না জানি কি মনে করিবেন--মুন্নার হাত দুখানি পা হইতে ছাড়াইয়া দিয়া দাসীকে বলিলেন—"দাসি যাও ইহাকে উঠাইয়া লইয়া যাও"—মুন্নার আর কাঁদিবারও সামর্থ্য রহিল না—পা হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী যেন গহ্বর হইয়া গেল—বিশ্ব চরাচর মাথার মধ্যে ঘূর্ণ-আবর্ত্তের মত ঘুরিয়া উঠিল, এক বার অস্ফুট ক্রন্দন স্বরে মর্ম্মতল হইতে এই কথাগুলি ফুকরিয়া উঠিল "আমি কোথায় যাইব গো? কোথায় আর এ অভাগিনীর স্থান আছে।" তারপর স্বামী ও সপত্নীর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছু পরেই সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল—একজন দাসী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া সেখান হইতে লইয়া গেল। উৎসব-গৃহ শোকময়-নিস্তব্ধতায় পূর্ণ করিয়া মুন্না চলিয়া গেল।

থাকিয়া থাকিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে, একটা একটা বড় বাতাসের দমকা সেই স্তব্ধ গৃহটাকে বলে নাড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে, নীরব স্তম্ভিত ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ একটা গভীর গম্ভীর ভীষণতা ঢালিয়া দিতেছে। সেই মেঘ বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের মধ্যে কে যেন অতি করুণ-স্বরে—বজ্র হইতে হৃদয়ভেদী-স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিতেছে—"কোথায় যাইব গো আমার আশ্রয় কোথায়।"

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্মৃতি।

সলেউদ্দীন যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল। তাঁহার দুর্গতির আর সীমা রহিল না। মুন্নাকে লইয়া যাইবার পর সে রাত্রে তখনি রোসেনারা সখীদের সহিত মান গৃহে গমন করিয়া হুড়কা বন্ধ করিয়া দিলেন। সলেউদ্দীন দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া তারকেশ্বরের যাত্রীর ন্যায় প্রাণপণে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেবী প্রসন্ন হইলেন না—দ্বার যেমন রুদ্ধ তেমনিই রহিল। নবাবশা দ্বারদেশে পড়িয়া ধন্না দিতে লাগিলেন, আর গৃহ মধ্যে মহা কমিটি আরম্ভ হইল। সখীদের কাছে যত যাহার

কথার অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহা সকলি বেচারা সলেউদ্দীনের উপর প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কোন সখী নাক তুলিয়া বলিলেন, "আমাদের সখীর কি যোগ্য—বানরের কাছে গজমুক্তার কি আদর আছে! এ রত্নের গৌরব তিনি কি বুঝিবেন?" কেহবা বলিল "আমাদের বেগমের কি আর বর জুটত না—এমন সাধাসাধি করে কে বিয়ে করতে বলেছিল—আসুন না একবার—মনের সাধে এ কথা শোনাই।" আর একজন অমনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সাধা স্বরে বলিলেন—"মরণ নাই তোমার, তুমি আবার তাঁর সঙ্গে কথা কইতে যাবে, বেগম সাহেব কথা কইতে গেলে আমরা মুখ চেপে ধরব—ছি!" বেগম সাহেব এ অভিনয়ের নায়িকা, তিনি শয্যাগত হইয়া বালিসে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়াছিলেন, মনে মনে বলিতেছিলেন—"আমার মত দুঃখী আর জগতে কেহ নাই।" সখীদের মমতার কথায় ধীরে ধীরে চন্দ্র কলার মত মুখের অর্দ্ধভাগ বালিসের বাহিরে প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"সখি আমার মরণ হইল না কেন? আল্লা এখনি আমাকে নিন, এ দুঃখ আমার আর সহে না। আমার রূপ নাই, তাকি আর আমি জানিনে, যে আমাকে তাঁর রূপবতী স্ত্রীর রূপটা দেখিয়ে দিলেন—ভাল তাকে নিয়ে থাকলেই ত ভাল হোত—তখন তবে বিয়ে ভাঁড়াবার আবশ্যক কি ছিল।" রূপের গর্ব্বটা মনে মনে বড় অধিক ছিল বলিয়াই—একথা রোসেনারা বলি-

লেন। রূপটা যে রোসেনারার নেহাত মন্দ এমন আমরাও বলিতে পারি না। তবে রোসেনারাকে দেখিয়া যদি উপন্যাসের নায়িকা-প্রতিমা কাহারো মনে উদয় না হয় তবে দোষ আমাদের নাই। যাহা হউক রূপের প্রশংসা রাতদিন শুনিতে শুনিতে রোসেনারার কান বেদনা করিত, তাহার পর যখন তিনি আগাগোড়া গহনা পরিয়া সাজসজ্জা করিয়া আসিতেন—তখন সখীদের কেবল মূর্চ্ছা যাইতে বাকী থাকিত—কাজেই রোসেনারা আর্শিতে আপনাকে দেখিয়া নিজেও সেরূপে পাগল হইয়া পড়িতেন। কিন্তু মুন্নাকে দেখিয়া বুঝি সে গর্ব্বে একটুখানি আঘাত লাগিয়া থাকিবে, নিদেন আর একবার রূপের প্রশংসাটা শুনিয়া আশ্বস্থ হইবার বুঝি ইচ্ছা হইয়াছে!

রোসেনারার কথায় একজন সখী বলিল—"রূপ! ও রূপের কড়ে আঙ্গুলের আগে যোগ্যি হ'ক—তখন রূপের কথা বলো।" রোসেনারা বলিলেন—"তো'দের ঐ এক কথা। রূপ থাকলে কি আর এর মধ্যে এত পুরাণো হয়ে পড়ি যে সতীন এসে গায়ে পড়ে অপমান করতে সাহস পায়।" দুঃখের উচ্ছ্বাস বড় বাড়িয়া উঠিল—বেগম সাহেব আবার বালিসে মুখ লুকাইয়া ফেলিলেন, বেগম সাহেবের দুঃখে সখীদের সকলের বুক ফাটিয়া উঠিল, চারিদিকে হা হুতাশ পড়িয়া গেল, নাক ঝাড়ার শব্দ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল, কেহ কেহ সুর করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

যাহার মনে যত শোক আছে সব ঝালাইয়া উঠিল। সময় বুঝিয়া একজন সখী দরজা খুলিয়া দিল—এইরূপ কান্নাকাটি মহা শোচনীয় ব্যাপারের মধ্যে সলেউদ্দীন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সখীরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"নবাবসা অসিয়াছেন"—তখন রোসেনারা বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা উহাকে যাইতে বল এখানে আসিলে ভাল হইবে না।" সখীরা কিছু না বলিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল—সলেউদ্দীন সাহসে নির্ভর করিয়া তাঁহার পদতলে আসিয়া বসিলেন। তাহার পর অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, রোসেনারার পা মাথায় ধরিয়া অনেকক্ষণ হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন, তবু সে দারুণ মান ভাঙ্গিল না, তখন হতাশ হইয়া তিনি বলিলেন—"তবে আমি চলিলাম, রোসেনারা আমার প্রতি বিমুখ—সংসারে আমার কি কাজ; আমি সব ত্যাগ করিয়া ফকীরী গ্রহণ করিতে চলিলাম।" তখন রোসেনারা বলিয়া উঠিলেন, "সংসারে থাকিতে সাধ নাই—তা আমি কি জানিনা, ও কথা আর কি না শোনাইলেই নয়? কার জন্য সংসার ছাড়িবে তা বুঝিয়াছি। ও মাগো! আমার অদৃষ্টে এত অপমানও ছিল।" সলেউদ্দীন মহা বিপদে পড়িলেন, বলিলেন—"তোমার হাতে আমি হৃদয় প্রাণ জীবন মরণ সব বিকাইয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব?"

রোসেনারা বলিলেন—"ও আমার কপাল! এতর উপর আবার মিথ্যা কথা!"

সলেউদ্দীন বলিলেন—"আমাকে পায়ে রাখ, অবিশ্বাস করিও না ; সে কে আমি তাহাকে চিনিও না।"

'তাহাকে চিনি না'! রোসেনারার অত্যন্ত রাগ হইল, বলিলেন—"মাগো আমার অদৃষ্টে এতও ছিল, এত প্রবঞ্চনা এত প্রতারণা এ ত স্বপ্নেও জানিনে!"

সলেউদ্দীন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার কি ছু এক কথা বলিতে গেলেন—কিন্তু কিছুতেই রোসেনারা বুঝিলেন না, প্রতি কথায় তিনি বিপরীত অর্থ বুঝিয়া রাগিয়া রাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। সলেউদ্দীন অবশেষে নিরুপায় হইয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তাহাতে আরো মন্দ ঘটিল, রোসেনারা কাঁদিয়া বলিলেন "ওরে আমার কেউ নেইরে—আমি মরিলে কার ক্ষতি" বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে করিতে অন্য গৃহে যাইবার জন্য বিছানা হইতে উঠিলেন। সলেউদ্দীন উঠিয়া তাহার পা ধরিয়া বলিলেন,"যাইওন যাইওনা, এবারকার মত দোষ ক্ষমাকর।"

রোসেনারা ছিনিয়া পা সরাইয়া চলিয়া গেলেন—একবার ফিরিয়া চাহিলেন না। সলেউদ্দীন পদানত মস্তক উঠাইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলেন, কষ্টে দুঃখে মনের ভিতর মন যেন বসিয়া গেল। রোসেনারার জন্য মদ ছাড়িয়াছেন—বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়াছেন, দিবানিশি সাধ্যসাধনা ছাড়া আর জানেন না, কিছুতে তবু তাহার মন পাইলেন না, আর মুন্না?" কত কথা একে একে মনে উদয়

হইতে লাগিল। কিরূপ নির্দ্দয় পদেই তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন! তাহার সহিত কিরূপ পিশাচের মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন! হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া সলেউদ্দীন আজ অন্যের বেদনা বুঝিতে পারিলেন, সহস্র স্মৃতি এক কালে তাঁহার মনে জ্বলিয়া উঠিল। মুন্নার সেই আত্ম-বিসর্জ্জী প্রেম, বিনীত ব্যবহার, সরলতাময় বিষণ্ণমূর্ত্তি, তাহার পর তাহার সেই দীন হীন ভিখারিণী বেশ—সেই হৃদয়ভেদী আকুল ক্রন্দন আর নিজের সেই পিশাচ-নির্দ্দয় পশু-অধম ব্যবহার, তাঁহার মনে জ্বালামুখীর বিপ্লব আনিয়া ফেলিল। সলেউদ্দীন আর পারিলেন না, সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টি-বর্ষণশীল স্তম্ভিত আকাশের নীচে একটা বটগাছে একটা পেঁচা বিকট স্বরে ডাকিয়া উঠিল, যেন বলিয়া উঠিল, "পাষণ্ড, নিষ্ঠুর, পিশাচ, এই ভয়ানক নিশীথে তাহাকে তাড়াইয়া দিলি!" সলেউদ্দীন কানে আঙ্গুল দিলেন। আবার সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দন, বজ্রবৃষ্টির প্রাণের মধ্যে সেই স্বর, সেই কথা, "আমার আশ্রয় কোথা আমি কোথায় যাইব।" সলেউদ্দীন পাগলের মত হইয়া ভাবিলেন—"কোথায় যাইব, এ যন্ত্রণার নিষ্কৃতি কোথায় গিয়া পাইব?" কিন্তু তখনি বুঝিলেন, এ যন্ত্রণার নিষ্কৃতি আর নাই, চির জীবন তাঁহার মনে এ আগুন জ্বলিয়া রহিল ইহা হইতে আর মুক্তি পাইবেন না। জ্বালামুখীর অগ্নি উচ্ছ্বাসের ন্যায়

যখন এ আগুণ হৃদয় ফাটিয়া, ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া, চূরমার করিয়া বাহির হইতে চাহিবে তখনও হাসির আবরণে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, বিলাসের স্রোতে তাহা ডুবাইতে হইবে। হৃদয়ে এতটুক মনুষ্যত্ব নাই, এতটুক তেজ নাই যে জীবনের স্রোত উল্‌টাইয়া ফেলিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জীবন কাটাইতে পারেন। বিলাস তাঁহার শরীরের রক্ত শোষণ করিয়াছে হৃদয়ের বল পান করিয়াছে, পশু হইতেও তাঁহাকে অধম নীচ করিয়া তুলিয়াছে, জীবন থাকিতে তিনি জীবনহীন। এই মনুষ্যত্ব-বিহীন নির্জীব প্রাণ লইয়া অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে তাঁর ন্যায় দুর্ব্বল কাপুরুষের সাধ্য নাই, একটা মড়ার মত অদৃষ্টের তাড়নায় প্রবৃত্তি স্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ানই এ জীবনের পরিণাম তাহা বুঝিতে পারিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈরাগ্য।

সেই ঝটিকা তরঙ্গিত অন্ধকার-নিশীথে অসহায় নিরাশ্রয় বালিকা, অন্তঃপুর-তাড়িত হইয়া, বাত্যাহত তৃণের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল।

ভীষণ অন্ধকার-রাক্ষস নিজ করালগ্রাসে বিশ্বচরাচর গ্রাস করিয়া মুহুর্মুহু বজ্র হুঙ্কার ছাড়িতেছে। ঝটিকাবলে বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া নদী তরঙ্গিত করিয়া ভূলোক দ্যুলোক কম্পমান করিয়া বিদ্যুতের অট্টহাসি হাসিতেছে। তাহার সহিত প্রাণপণে যুঝিতে যুঝিতে প্রকৃতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এই প্রাণ সংহারক নিশায় দেবদানবেরা ভয়ে চমকিয়া যাইতেছে, কিন্তু ক্ষুদ্র এক বালিকার তাহাতে কিছু-মাত্র ভয় নাই। অন্ধকারে তাহার ত্রাস নাই, ঝটিকার প্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মস্তক দিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারা বহিয়া পড়িতেছে, মুন্না তাহা যেন জানিতেও পারি-তেছে না, বৃক্ষ শাখা দুমদাম শব্দে ভাঙ্গিয়া তাহার অতি নিকট দিয়া গায়ে লাগিতে লাগিতে ভূমে পড়িয়া যাই-তেছে, সে একবার চাহিয়া দেখিতেছে না। গাছে বজ্র আসিয়া পড়িতেছে, ধূ ধূ করিয়া গাছ জ্বলিয়া উঠিতেছে, মুন্না তাহা ধরিবার জন্যই যেন প্রাণপণে ছুটিতেছে, তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, মুন্নার আর মৃত্যুতে ঘৃণা

নাই, মৃত্যুই মুন্নার শান্তি, মৃত্যুকে তখন মুন্না মনে মনে বরণ করিয়াছে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তখন এমন আর কোনরূপ দুঃখ কষ্ট ভীষণতা নাই যাহা মুন্নাকে ভয় দেখাইতে পারে, মুন্না যে আঘাত সহ্য করিয়াছে, মুন্না যে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছে, তাহার নিকট আর এ সকল কিছুই নহে, সে আঘাত হইতে আর কি আঘাত আছে, যাহাতে আর মুন্নার ভয় হইবে? মুন্না বর্ম্মাবৃত নির্ভীক হৃদয়ে, শ্রান্তিহীন সবল চরণে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিরত চলিয়া যাইতেছে। যখন প্রভাত হইল, ঝড় জল থামিয়া গেল, জগতের আঁধার অশান্ত-মুখ সূর্য্যের ভয়ে লুকাইয়া পড়িল, বিশ্বের যত আঁধার সমস্তই যেন ক্ষুদ্র বুকে আঁটিয়া লইয়া তখনো মুন্না চলিয়া যাইতেছে, বিশ্রাম করিতে সে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। কি এক শক্তি যেন তাহাকে সজোরে চালাইয়া দিয়াছে, থামিতে যেন আর তাহার সাধ্য নাই।

বেলা হইল, রোদ উঠিল, চারিদিকে লোকজন ব্যস্ত ভাব লইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল, মুন্নার চোখের সমুখে একটা অট্টালিকা আসিয়া পড়িল, মুন্না তখন চকিতের মত থামিয়া পড়িল, চারিদিকের সমস্ত তখন তাহার নয়নে পড়িল, সে দেখিল যে বাড়ীর সমুখে সে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহাদেরি বাড়ী।

হুগলি হইতে পাণ্ডুয়া প্রায় সাত ক্রোশ দূরে, দুর্ব্বল-মুন্না

আজ প্রজ্জ্বলন্ত-যন্ত্রনার অসীম উত্তেজনা বলে বলীয়ান হইয়া এক রাত্রের মধ্যে অনায়াসে এত পথ অতিক্রম করিয়া—অন্য সময়ের অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে।

দুই দিন আগে যে স্থান তাহার সহস্র মায়ার আধার ভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল, যাহার নিকট বিদায় লইতে সে কষ্টে মুহ্যমান হইয়াছিল—সেই বাড়ী, সেই বাগান, সেই নদী আবার তাহার চোখে পড়িল, কিন্তু আজ তাহা দেখিয়া মুন্নার হৃদয় একবার চঞ্চল হইল না, চোখে এক ফোটা জল পড়িল না, মুন্না অবিচলিত হৃদয়ে স্থির কটাক্ষে সেই বাটীর প্রতি চাহিয়া দেখিল, সব মিথ্যা, সব মায়া, সব ভ্রান্তি! মুন্না আর চলিল না, সেইখানে একটি গাছ তলায় বসিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, নদী বহিয়া যাইতেছে, আর্দ্র গাছপালা নবীন সরসভাবে দাঁড়াইয়া আছে, পশুপক্ষী নরনারী প্রাণের আনন্দে চলিয়া যাইতেছে, সকলি মুন্নার মায়া বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; জগৎ সংসার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলের দিকে মুন্না চাহিয়া দেখিল, সকলি মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নৌকায় মাঝিরা গান গাহিয়া যাইতেছে, যুবতীরা হাসিয়া গঙ্গাস্নানে আসিতেছে—মুন্না ভাবিল, এ গান কেন? এ হাসি কেন? চারিদিক দেখিয়া হতাশভাবে মুন্নার মন বলিতে লাগিল—জগতে সুখ নাই জগতে সত্য নাই। জগতের পরপারে সুখের নিবাস, ইহার বাহিরে সত্যের রাজ্য, জগৎ মিথ্যা,

জগৎ যন্ত্রণাময়"। মুন্নার হৃদয়ে আশা নাই, বাসনা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, কি এক ঘোর বৈরাগ্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে—মুন্না শূন্য দৃষ্টিতে, শূন্য ভাবে, জগতের দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমে মুন্নার শ্রান্তি অনুভব করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল, অবসন্ন দেহ শিথীল হইয়া পড়িল, মুন্না সেই বৃক্ষ তলে শয়ন করিল। ক্রমে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

সেই দিন প্রাতঃকালে মহম্মদ নৌকায় হুগলী পৌঁছিলেন। নৌকা হইতে প্রথম তাঁহাদের সেই পুরাতন পরিচিত বাড়ীটা যখন তাঁহার চোখে পড়িল—তিনি এতদিনকার দুঃখ কষ্ট সকল ভুলিয়া গেলেন, বহুদিনের পর মুন্নাকে দেখিবার আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি বাড়ী আসিয়া কম্পিত হৃদয়ে দ্রুত পদে মুন্নার গৃহে প্রবেশ করিলেন—কিন্তু মুন্না কোথায়! দেখিলেন তাহার শয্যা অমনি পড়িয়া আছে, অনেক দিন যেন তাহা কেহ স্পর্শ করে নাই। একটা কষ্টের বিদ্যুৎ—একটা ভীষণ দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয় দিয়া বহিয়া গেল।—তিনি সে ঘর ফেলিয়া আকুল হৃদয়ে অন্য ঘরে ঘরে মুন্নাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ঘরে না পাইয়া উদ্যান দেখিতে আসিলেন—নদীতীরের উদ্যানে অনেক সময় মুন্না বসিয়া থাকিত। সেখানে আসিয়া উন্মত্ত দৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ করিলেন। সহসা উদ্যান-বাহিরে দূরের বৃক্ষতলায় দৃষ্টি পড়িল,—শীর্ণ বিবর্ণ এলায়িত কুন্তল, কেও রমণী বৃক্ষতলে পড়িয়া? মহম্মদ দ্রুতপদে রুদ্ধ শ্বাসে বাটীর বাহিরের সেই বৃক্ষ তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবা মাত্র সন্ন্যাসীর তেজস্বী মূর্ত্তি নেত্রপথে পড়িল। গাছের ব্যবধান ও মনের ব্যাকুলতা বশত দূর হইতে এতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। সন্ন্যাসী রুদ্ধশক্তির ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে মুন্নার শিয়রে দাঁড়াইয়া মুন্নার অর্দ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিহীন নির্জীব মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার নত মুখ নতই রহিল—তিনি অঙ্গুলির সঙ্কেতে মহম্মদকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহম্মদ মুন্নার মুখের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সুষুপ্ত মুখে কি বিশ্রামের ভাব! কি স্বর্গীয় প্রশান্তি! মহম্মদ মুন্নার মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠিল। কতদিন আগে—বাসনার মোহে যে জাগন্ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাই মনে পড়িয়া গেল। মুন্নার ঠিক সেই প্রশান্ত মুখ—তাহার মাথার কাছে ঠিক সেই-রূপ ভাবে সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া। কিন্তু সে দিন স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন—আজ তাহা স্বপ্ন নহে—আজ সত্য ঘটনা। যাহা সত্য হইবার জন্য এতদিন প্রাণপণে প্রার্থনা করিয়াছেন

আজ তাহা সত্য হইল, আজ তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, কিন্তু কি নিদারুণ রূপেই পূর্ণ হইল! হায়! তিনি কি এই দিনের জন্যই এতদিন লালায়িত হইয়া ছিলেন? তিনি যে মুন্নার শান্তি চাহিয়াছিলেন সে কি এই শান্তি? তিনি যে কতদিনের পর কতদূর হইতে ছুটিয়া মুন্নাকে দেখিতে আসিয়াছেন সে কি মুন্নার এই মৃত মুখ? স্নেহময় ভ্রাতার প্রাণ একবার মৃত বোনের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া আদর করিয়া ডাকিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল, যেন সে স্নেহের স্পর্শে সে স্নেহের ডাকে মৃত মুন্নাও সাড়া দিয়া উঠিবে,—অথচ মুন্নার নিকট অগ্রসর হইতে যেন তাঁহার ক্ষমতা নাই,—মহম্মদ নির্জীব পুত্তলিকার ন্যায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আলোক।

মহম্মদ অচল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া কাতর বাষ্পাকুল দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন।—সন্ন্যাসীর মুখ তখন উন্নত, তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টিতে মহম্মদের দৃষ্টি মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত হইয়া গেল, ক্রমে লোপ পাইয়া আসিল, বাহিরের আর কিছু তিনি দেখিতে পাইলেন না, ক্রমে নিজের কাছ হই-

তেও তিনি সরিয়া পড়িতে লাগিলেন, অল্পে অল্পে আপনাকে ভুলিয়া গেলেন,—অন্তর বাহির বিস্মৃতিতে ডুবিয়া গেল, সন্ন্যাসীর অস্তিত্বে তিনি নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিলেন, সন্ন্যাসীর জ্ঞান তাঁহার নিজের বলিয়া মনে হইল—সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে তিনি দৃষ্টি পাইলেন,—এক অপরূপ দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে বিরাজিত হইল।

সন্ধ্যাকাল, বৃক্ষরাজি-শোভিত বিজন গিরিশিখর, শিখর-তলে শুভ্রালোক-দীপ্ত, অপার্থিব স্নিগ্ধ-গন্ধপ্লুত পবিত্র কুটীর, কুটীরে অজিনোপরি এক পবিত্র সৌম্য মূর্ত্তি মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, সম্মুখে দুই ভ্রাতা ভগিনী—তাঁহার ভ্রাতৃ-সন্তানদ্বয়—অপরাধীর ন্যায় বিষণ্ণ নতমুখে দণ্ডায়মান, তিনি সেই আনত মুখ-যুগলের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া। তাঁহার গম্ভীর দৃষ্টি অশ্রুময়, প্রশান্ত ললাটে দুইটি বিষাদ-রেখা—সেই রেখায় এই কথাগুলি লেখা, 'বৎসগণ, পাপ হৃদয়ে, কার্য্যে নহে। অতিথী মুসলমান বলিয়া তাহাকে হৃদয়ের-আতিথ্য দানে পরাঙ্মুখ হইলে! এখনো তোমাদের সময় হয় নাই বৎস, যাও সংসারে যাও, সেখানে সাম্য অভ্যাস কর,—নিষ্কাম কর্ম্ম অবলম্বন কর'।

দেখিতে দেখিতে সে রেখা মুছিয়া গেল, সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল,—সহসা দারুণ এক অন্ধকারের মধ্যে মহম্মদ ডুবিয়া গেলেন। সে অন্ধকার হইতে যখন উঠিলেন—তখন তিনি আর সে বিজন কুটীর দেখিতে পাইলেন না।—

দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে এক কোলাহলময় শোকবিষাদময় জনতা বিরাজিত, সেই জনতার মধ্য দিয়া দুই ভাই বোনে পাশাপাশি চলিয়া যাইতেছে, দূর হইতে একজন তাহাদিগকে চাহিয়া দেখিতেছেন। ক্রমে সে দৃশ্য মহম্মদের কাছে সরিয়া আসিতে লাগিল, সরিতে সরিতে ঘূর্ণ্য-চক্রের মত তাঁহার নয়নের সম্মুখে দৃশ্যের উপর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, সপ্তবর্ণের চক্র যেমন ঘুরিতে ঘুরিতে এক বর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে সমস্ত দৃশ্যই অবশেষে একাকার হইয়া তাঁহার ছায়ার মত তাঁহাতে মিলাইয়া পড়িতে লাগিল, এক তিনি সহস্র ছায়ায় যেন খণ্ড বিখণ্ড হইয়া তাহার মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন, অবিশ্রান্ত ঘুরিতে লাগিলেন, তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, তিনি সেই ঘূর্ণ-মান সহস্র ছায়ার উপর ঘুরিয়া পড়িলেন। এইখানে তাঁহার স্বপ্ন শেষ হইল, মহম্মদ জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন জাগিয়া উঠিলেন—তখন তিনি আর সে মহম্মদ নহেন, তখন তাঁহার চারিদিকে এক দিব্য জ্ঞানালোক জ্বলিতেছে। তখন তাঁহার আর দুঃখ বিষাদ নাই—ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। তখন তাঁহার হৃদয় এক পরমানন্দে আপ্লুত হইয়াছে।

মহম্মদ জাগিয়া দেখিলেন—তাঁহারা আর উদ্যানে নাই, মুন্না তাঁহার শয্যা গৃহে পালঙ্কে শুইয়া আছে, তিনি ও ভোলানাথ তাহার নিকটে দণ্ডায়মান,—মুন্নার ও ভোলা-

নাথের বিস্ময়পূর্ণ আনন্দের দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত।

সন্ন্যাসী দুই ভ্রাতা ভগিনীকে একরূপ সুপ্ত অবস্থাতেই এখানে পৌঁছিয়া গিয়াছেন—গৃহে আসিয়া ইহাঁদের নিদ্রা ভাঙ্গিল। ভোলানাথ তাঁহাদের আসিবার কিছু পূর্ব্বে বন্ধন-মুক্ত হইয়া এইখানে আগমন করিয়াছেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

একপথে।

মুন্নার প্রথম ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্র মসীনের স্নেহময় করুণ দৃষ্টি তাহার যখন চোখে পড়িল—তাহার স্থির কটাক্ষ সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল—বদ্ধান্ধকার শুষ্ক শীর্ণ মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে তখনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাহার মনে হইল সে স্বপ্ন দেখিতেছে।—মুন্নাকে জাগন্ত দেখিয়া—তাহার মৃত প্রায় দেহে জীবন দেখিয়া মসীনের আহ্লাদের সীমা রহিল না—আহ্লাদ-আর্দ্র স্বরে মুন্না মুন্না করিয়া তাহার হাত দুই খানি আপনার হাতে তিনি তুলিয়া লই-লেন। তাঁহার স্নেহের স্বরে স্নেহের স্পর্শে মুন্না আবার চোখ মেলিল—। আস্তে আস্তে বিস্ময়ের সুরে বলিল—"মসীন? একি স্বপ্ন দেখিতেছি"।

মসীন উদ্বেলিত স্নেহভরে আর একবার মুন্না মুন্না করিয়া উঠিলেন—মুন্নাও নীরব উথলিত হৃদয়ে তাঁহার মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ভোলানাথের নেত্র দিয়া দরদর করিয়া আহ্লাদের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। যে দিন মহম্মদ বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন—সেই দিন হইতে কতনা আগ্রহের সহিত ভোলানাথ এই মিলন-দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন, সেই দিন হইতে কতনা আশঙ্কায় কষ্টে—কতনা উৎকণ্ঠায় দিন গুলা অতিবাহিত করিয়াছেন, কতদিন পরে আজ সেই প্রত্যাশিত দিন আসিয়াছে—আহ্লাদে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন,—আজ তানপূরা-টাকে তাঁহার বড়ই মনে পড়িতে লাগিল—একবার ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া মহম্মদের পায়ের কাছে পালঙ্কের নীচে বসিয়া পড়িলেন - বসিয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

ওগো তারা দয়াময়ি, তোমার দয়া কেবা জানে!
বিশ্বভুবন বেঁচে গেছে করুণা অমৃত পানে।
যে না চাহে তোমায় মা গো, তারো হৃদে তুমি জাগো,
অন্ধজনের নয়ন ফুটাও, পুণ্য ঢালো পাপীর প্রাণে।
মাগো আমার তুই মা তারা, ত্রিভুবনের নয়ন তারা,
তোর করুণা ভাবতে গেলে নয়নের জল নাহি মানে।”

মুন্না ক্ষণকাল পরে যখন আত্মস্থ হইল, তখন তাহার আগেকার কথা মনে পড়িয়াছে, সেই রাত্রের ঝড় বৃষ্টি,

তাহার স্বামীর ব্যবহার, তাহার একাকিনী অবস্থা সে সকলি মনে পড়িয়াছে—তাহার পর? তাহার পর আর স্মৃতি নহে,—তাহার পর যাহা সম্মুখে দেখিতেছে তাহা সত্য জাগন্ত ঘটনা, স্মৃতির স্বপ্নময় ছায়া নহে—সত্যই এখন মহম্মদ তাঁহার সম্মুখে। মুন্না জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"মসীন,—পিতা!'

হঠাৎ সে প্রশ্নে মসীন থতমত খাইয়া গেলেন, মুন্নার এই অবস্থায় কি করিয়া তাহাকে পিতার মৃত্যুর সংবাদ দিবেন? তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। মুন্না স্পন্দন-হীন নিরশ্রু-নেত্রে একটা পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই পাষাণ ভাব দেখিয়া ভোলানাথ ভীত হইলেন, মহম্মদ কাতর হইয়া পড়িলেন; অনেকক্ষণ পরে পাষাণ মূর্ত্তি কথা কহিল—মুন্না আপন মনে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "বুঝিয়াছি—মসীন বুঝিয়াছি—যে ভালবাসার উপর স্থায়ী বিশ্বাস বাঁধিয়াছিলাম তাহাও একটা স্বপ্নের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তবে যাহা পাই নাই, তাহার জন্যই বা দুঃখ কি? পাইলেই বা কি হইত, আর একটা মিথ্যা বিশ্বাসকে জড়াইয়া থাকিতাম বই আর কিছুই নয়।" মুন্নার সেই আকুল বৈরাগ্য ভোলানাথের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—"বিবিজি, এখানে যাহা মিলিল না তাহা অন্যত্র গিয়া পাইবে। ভগবান্ চিরদুঃখ কাহারো অদৃষ্টে লিখেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার করুণাময় নামে দোষ জন্মে।"

মুন্না আগে কখনো ভোলানাথের সহিত কথা কহে নাই—কিন্তু আজ তাহার আর কোনরূপ সঙ্কোচ ভাব নাই—সে তাহার দিকে চাহিয়া একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "তাঁকে জানে ? কে জানে যে অন্যত্র গিয়াও এই মিথ্যা সুখ দুঃখ হাসি তামাসা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না ; যেমন এই জন্মের উপর আমার হাত ছিলনা, আপনার ইচ্ছায় আসি নাই, একটা অদৃষ্ট চক্রে পাড়িয়া অনবরত অনিচ্ছা সত্বেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছি, কে জানে যে ইহার পরও আবার এইরূপ মিথ্যা বাসনা কামনা লইয়া হাহা করিয়া বেড়াইতে হইবে না ?"

মসীন যেন চমকিয়া গেলেন, মুন্না এ সব কোথা হইতে শিখিল ! কি যেন বলিতে গেলেন—কিন্তু তাহার আগেই ভোলানাথ বলিলেন "তাহা যদি হয় তবে এই মিথ্যাই সত্য, আমাদের মত লোকের এ মিথ্যা হইতে ত্রাণ পাইবারও শীঘ্র আশা নাই।"

মুন্না বলিল—অতি দৃঢ় বিশ্বাসের ভরে বলিল, "তাহা হইতে পারে না। সত্য আছে—জগতের পরপারে সত্য লুকাইয়া আছে, আমরা যাহা দেখিতেছি তাহার বাহিরে আশা লুকাইয়া আছে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া সংসারের সুখ দুঃখের বাহিরে গিয়া তবে তাহা লাভ করা যায়"।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল, ওকথা যেন ঐখানেই

শেষ হইল,—অনেকক্ষণ পরে মন্না বলিল, "মসীন আমার কাছে কিছু লুকাইও না, যা কিছু আছে এখনি বল, আমি সকলি সহ্য করিতে পারিব।" মসীন সজল নেত্রে তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার পীড়ার অবস্থা, তাঁহার মৃত্যু-ব্যাপার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, মুন্না যেন বজ্র দিয়া হৃদয় বাঁধিয়াছে, নীরব নিস্পন্দভাবে সে সকল শুনিয়া যাইতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে যখন মহম্মদ একবার থামিলেন -তখন মুন্না একবার চোখ বুজিয়া দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "পিতা তুমি শান্তির আশ্রমে গিয়াছ, আমার অশ্রুজল যেন তোমার সে সুখে আর ব্যাঘাত না দেয়" মুন্নার স্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল—মুন্না দৃঢ় ভাবে প্রাণপণে উথলিত অশ্রুকে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, যখন কৃতকার্য্য হইল, তখন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মসীনের দিকে চাহিয়া বলিল, "তারপর তিনি কি বলিলেন?"

মসীন মতাহারের শেষ কথা আস্তে আস্তে বলিয়া গেলেন। মুন্নার পাংশু মুখ আরো পাংশু হইয়া উঠিল। মুন্না আর চ'খের জল রাখিতে পারিল না—মনে মনে বলিল—"মৃত্যু-কালেও এই হতভাগীর কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছ পিতা?"

চারিদিক নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল, কিছু পরে মহম্মদ অঙ্গাবরণ হইতে পিতৃদত্ত কবচ বাহির করিয়া মুন্নার হাতে

দিলেন। মুন্না দেখিয়া নীরবে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিল। তিনি উলটিয়া পালটিয়া তাহার চারিদিক দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, এক জায়গায় টিপিয়া খুলিবার একটা কল রহিয়াছে। তাহা টিপিবা মাত্র কবচের একদিক খুলিয়া গিয়া ভিতরে একখানি কাগজ দেখা গেল। মহম্মদ কাগজখানি বাহির করিয়া পড়িয়া দেখিলেন উহা একখানি দানপত্র। তাঁহার বাগানের একস্থানে বৃক্ষতলে স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ কতকগুলি কলস পোতা আছে ঐ পত্রে সে কথার উল্লেখ করিয়া তাহাই মতাহার মুন্নাকে দান করিয়া গিয়াছেন। নিজের পড়া হইলে মহম্মদ তাহা মুন্নাকে পড়িয়া শুনাইলেন। মুন্না অবিচলিতভাবে শুনিল,—ভোলানাথ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"বিবিজি, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দাও, অসহায়ের যিনি সহায় তাঁহারই এ করুণা।"

মুন্না শুষ্ক অধরে একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল—"ভাই অসহায়ের যিনি সহায়, তাঁহার যে কত করুণা, তাহা ধনহারা হইয়া আমি যেমন বুঝিয়াছি, ধন থাকিতে তেমন বুঝি নাই। ঐশ্বর্য্যহীন হইয়া আমি যে শান্তি, যে অমৃত লাভ করিয়াছি সহস্র সম্পদও তাহা দিতে পারে না, তবে আজ এই সামান্য ধনের জন্য নূতন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ কি দিব? আমার ধন কাড়িয়া লইয়া তিনি আমাকে যে করুণা করিয়াছেন তাহার জন্য আমার সর্ব্বান্তঃকরণ তাঁহাকে আগেই দান করিয়াছি"।

মুন্না বলিতে বলিতে একবার দম লইতে থামিল, পরে মসীনের দিকে চাহিয়া বলিল—"মসীন,আমি ধনের প্রত্যাশী নহি। ধন রত্ন লইয়া আমি কি করিব? যেদিন একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলাম, সেদিন হয়ত এই ঐশ্বর্য্য পাইলে সন্তুষ্ট হইতাম, কিন্তু সে দিন আর নাই, সে দিন যে ভিকারিণী ছিল আজ সে সন্ন্যাসিনী। ভাই ঐশ্বর্য্যে কি কাহাকে সুখী করিতে পারে, এতদিন কি আমাদের ঐশ্বর্য্য ছিল না? কিন্তু কত সুখী ছিলাম বল দেখি?" মহম্মদ কোন কথা কহিলেন না, তাঁহার মনে সুখ কি দুঃখ কি ভাব বহিয়া গেল কিছুই বোঝা গেল না—তিনি কেবল আশ্চর্য্য নেত্রে মুন্নার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুন্না বলিল—"ভাই তুমি এই ধন গ্রহণ কর, যাহা কিছু আমার মনে কষ্ট আছে, শান্তির মধ্যে যে কিছু অশান্তি আসিয়া আমাকে বেদনা দেয়, সে কেবল তোমার জন্য। ভাই তুমি বিবাহ করিয়া এই ধন রত্নে সুখে থাক, সংসারে এই আমার একমাত্র ইচ্ছার অবশিষ্ট আছে।" বড় বড় দুই ফোটা জল মসীনের চোখ হইতে মাটিতে পড়িল, এ তাঁহার কষ্টের অশ্রু নহে, এ তাঁহার স্নেহ-হৃদয়ের আনন্দাশ্রু। তিনি বুঝিলেন মুন্না এত দিন পরে সত্য পথ পাইয়াছে, এখন আর সংসারের শোক তাপ তাহাকে পীড়া দিতে পারিবে না। এত দিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মসীন কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"মুন্না তোর

যা দশা, আমারও তাহাই হইবে। তুই সংসার ত্যাগ করিতে চাস্ আমারো সংসারে ইচ্ছা নাই, অনেক দিন হইতে আমার ভোগ তৃষ্ণা মিটিয়া গিয়াছে, সংসারে অনিচ্ছা জন্মিয়াছে, কেবল তোর জন্যই তবু এত দিন আমি সংসারী ছিলাম—তুই যদি সংসার ছাড়িতে চাস্ আমাকে বাঁধিয়া রাখিবার তবে কিছুই নাই, আমিও সংসার ছাঁড়িব, এ ধন যদি তোর না হয়, ইহা আমারো নহে, তবে ইহা দেবতার হউক।" সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্ত্তি সহসা তাঁহাদের নেত্র পথে পতিত হইল, তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

* * * *

তাহাই হইল, নব অধিকৃত ধনে সলেউদ্দীনের বন্দকী বিষয় মুক্ত করিয়া লইয়া তাহা তাঁহারা ধর্ম্ম কার্য্যে অর্পণ করিয়া আপনারা ভ্রাতা ভগিনীতে সামান্য অবস্থায় ঈশ্বরের চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ভোলানাথও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। মুন্নার অ. আকাঙ্ক্ষা রহিল না অতৃপ্তি রহিল না, তাহার হৃদয়ে মহাশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, সংসার হারাইয়া মুন্না হৃদয়ে স্বর্গ ধারণ করিল।

প্রতি দিন উষাকালে তাঁহারা নদী তীরে আসিয়া বসেন, ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠে, আবার সন্ধ্যা কালে নদীর পারে ডুবিয়া যায়, নদী গান করিতে করিতে জাগিয়া উঠিয়া গান গাহিয়া গাহিয়া সন্ধ্যাকালে আবার ঘুমাইয়া পড়ে,

ফুল হাসিতে হাসিতে ফুটিয়া আবার হাসিতে হাসিতে শুকাইয়া যায়, তাঁহারা তিন জনে সেই অসীম সৌন্দর্য্য হৃদয় ভরিয়া পান করেন, প্রাণ ভরিয়া জগৎ সংসারকে ভালবাসা বিতরণ করেন, বিশ্বপাতার গুণ গান করেন—তাহার পর সন্ধ্যা হইলে গৃহে চলিয়া যান। যখন ভ্রাতা ভগিনীতে দুজনে শুদ্ধ প্রাণে শুদ্ধ পবিত্র মূর্ত্তি লইয়া একটি বৃক্ষ তলে আসিয়া বসেন সমস্ত স্থানটা এক অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য্যে ছাইয়া পড়ে। তাঁহাদের দেখিবার জন্য কতদূর হইতে বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা ছুটিয়া আসে, তাঁহারা এখন জাতিকুলের অতীত, মুসলমান বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাদের স্পর্শ করিতে আর ভয় করে না। তাঁহারা সমস্ত প্রাণের সহিত আগন্তুকদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, কত ব্যথিত হৃদয় তাঁহাদের সেই পবিত্র উপদেশে শান্তি পাইয়া কত পীড়িত-দেহ তাঁহাদের হাতের পবিত্র স্পর্শে রোগমুক্ত হইয়া গৃহে গমন করে। মুন্না এইরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পান করিয়া—পরোপকারে প্রাণ ঢালিয়া—ঈশ্বরে জীবন দিয়া যে এক অসীম সুখ পাইয়াছে—তাহার সংসারী অবস্থার তীব্রতম সুখের সহিতও এসুখের তুলনা হয় না।

তাঁহাদের ন্যায় তাঁহাদের ধন ঐশ্বর্য্যও অনাথদিগের শান্তির উপায় হইল। সেই ধনে কত অতিথিশালা, কত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই ধনে শত শত দরিদ্রের জন্য

বৃত্তি স্থাপিত হইল, সেই ধনে হুগলির ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইল। হুগলির কলেজও গভর্ণমেণ্ট পরে মহম্মদ মসীনের সম্পত্তির টাকা হইতেই স্থাপন করিয়াছেন। তাহার পর শতাধিক বৎসর চলিয়া গিয়াছে এখনও হুগলি, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মাদ্রেসাগুলি তাঁহার দানের টাকা হইতে চলিতেছে, এখনো কত শত ছাত্র কত গরীব তাঁহার টাকায় প্রতিপালিত হইতেছে, আর এখনো কারুকার্য্য খচিত বিচিত্র ইমামবাড়ী ঊর্দ্ধমস্তকে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

উপসংহার।

উপসংহারে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের ইংরাজি বক্তৃতার সার অবলম্বনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহম্মদ মহসীনের যে বাঙ্গলা জীবন চরিত লিখিয়াছেন, 'হুগলির ইমামবাড়ী' লিখিবার সময় আমরা সেই বইখানি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তবে পাঠকগণ আমাদের আখ্যায়িকার সহিত ঐ জীবন চরিতের আখ্যায়িকার অনেক স্থলে অমিল দেখিতে পাইবেন। উক্ত জীবন চরিতে দেখা যায় যে, মুন্না বিবাহিত হইয়া যত দিন সধবা ছিলেন স্বামীর সহিত বেশ সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, পরে বিধবা হইয়া পুত্রাদি না থাকায় মহম্মদকে বিষয় সম্পত্তির অভিভাবক করেন—ও মৃত্যুকালে তাঁহাকেই সমস্ত দান করিয়া যান। কিন্তু হুগলি নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট আমরা অন্যরূপ গল্প শুনিয়াছি। তিনি বলেন—"মুন্নার স্বামী বড় বিলাসপ্রিয় ছিলেন, সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি সমস্ত বিষয় উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, মতাহার তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কন্যাকে শেষ দুর্দ্দশা হইতে বাঁচাইবার জন্য অবশিষ্ট লুকান সম্পত্তি মৃত্যুকালে তাবিজের ভিতর করিয়া দানপত্ররূপে কন্যাকে দিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পরে সত্যই যখন মুন্নার এমন অবস্থা আসিল যে তাহার ভিক্ষা করিতে

হইল—তখন সেই অবস্থায় একদিন হঠাৎ তাবিজের ভিতর হইতে সেই দানপত্র বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু তখন তাহার মন এতই বৈরাগ্যপূর্ণ হইয়াছে যে সে তাহা গ্রহণ না করিয়া ভ্রাতাকে দান করিল। মসীন তাহা লইলেন বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য দান করিয়া, তিনিও ভগিনীর ন্যায় ফকীর বেশে তাহার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

এই দুইটি গল্পের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা জানি না, তবে শেষেরটিই নাকি জনপ্রবাদ। তাই আমরা হুগলির ইমামবাড়ীতে শেষের গল্পটিই বদল সদল করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।
